তকদীর কি ?

মূল উর্দূঃ

হাকীমুল উম্মত মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মওলানা

আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

অনুবাদঃ

মাওলানা বশির উদ্দিন

প্রকাশনায়ঃ

মোহাম্মদী কুতুবখানা

৩৯/১, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ববিধাতা আল্লাহপাকের জন্য এবং বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তফার উপর ও তাঁহার পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবাদের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক।

আম্মাবাদ-

তাকদীর ঈমানের অন্যতম অঙ্গ। সাতটি মৌলিক বিষয়ের উপর ঈমান রাখা ঈমানদারের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহর উপর, তাঁহার ফিরিশতাদের উপর, তাঁহার প্রেরিত নবী রাসূলগণের উপর সকল আসমানী কিতাবের উপর, আখেরাতের উপর, তাকদীরের উপর অর্থাৎ ভালমন্দ যাহাকিছু হয় সব আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর। এই জন্য প্রত্যেক হাদীছগ্রন্থে তাকদীরের বয়ানের জন্য পৃথক অধ্যায় কায়েম করা হইয়াছে। ঈমানদারের জন্য ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাকদীরের উপরে ঈমান মানব জীবনের অস্থিরতা দূরীভূত করিয়া স্থিরতা পয়দা করে।

যুগ সংস্কারক হাকীমূল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) মানবজীবনের প্রয়োজনীয় এমন কোন দিক ছাড়েন নাই যাহা সম্বন্ধে তিনি একটি গ্রন্থ হইলেও রচনা করেন নাই। তাকদীর সম্বন্ধে তাঁহার রচিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে "তাকদীর কিয়া হ্যায়" একটি প্রশিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি কুরআন ও হাদীছের আলোকে তাকদীর সম্পর্কে আলোচর্না করিতে গিয়া বিভিন্ন উদাহরনের মাধ্যমে বিষয়টি সর্ব সাধারণের সামনে উপস্থাপন করিয়াছেন। মূলগ্রন্থ উর্দূ ভাষায় রচিত বিধায় বাংলা ভাষাভাষী মানুষ মহা উপকারী এই গ্রন্থের উপকারীতা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। সুতরাং বাংলা ভাষাভাষী মানুষও যাহাতে এই গ্রন্থ হইতে উপকৃত হইতে পারে এই দিকে খেয়াল রাখিয়া মোহাম্মদী লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে এই গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করার উদ্যেগ গ্রহণ করা হইয়াছে। অনুবাদ ও সম্পাদনার কার্য সমাপ্ত করার দায়িত্ব এই অধমের উপর অর্পন করা হয়েছে। এই অধম গ্রন্থের শব্দে শব্দে অনুবাদ করার প্রতি দৃষ্টি না দিয়া গ্রন্থের মূল বিষয়বস্ত পাঠক সমাজের সামনে তুলিয়া ধরার চেষ্টা করিয়াছে। এই বিষয় কতটুকু সফলকাম হইয়াছে; পাঠক সমাজ তাহা বিবেচনা করিবেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়িলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অবগত করিলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করনে সংশোধন করিতে প্রস্তুত থাকিব। সবচেয়ে বড় কথা পাঠক সমাজের কাছে দরখাস্ত রহিল তাহারা যেন এই প্রচেষ্টা কবুল করার জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করেন। আল্লাহ পাক কবুল করিলেই শ্রম সার্থক হইবে। অন্যথায় সবই অসার। অবশেষে আল্লাহ পাক যেন এই গ্রন্থের সাথে বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত সকলকে স্বীয় প্রিয় বান্দাদের মধ্যে শামিল করেন। এই দোআ করি।

নিবেদক
বশির উদ্দিন
জামিয়া ইসলামিয়া
ইসলামপুর, নরসিংদী

সূচীপত্র

বিষয় ঃ **পৃষ্ঠা ঃ**

বিষয় ঃ	পৃষ্ঠা ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

হযরত ইমাম আরিফ, মোহাক্কেক, তাজুল আরিফিন, যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম হুজ্জাতুল সলফ, ইমামুল খলক, সালেকীনদের পথ প্রদর্শক তাজউদ্দিন আবুল ফজল আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল করীম ইবনে আতাউল্লাহ সেকান্দরী (আল্লাহ পাক তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাকে খুশী করেন, আমাদিগকে এবং সকল মুসলমানদিগকে তাঁহার দ্বারা উপকৃত করেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক সবকিছু শুনেন। তিনি সকলের কাছে আছেন। সকলের দোয়া কবুল করেন।) বলিতেছেনঃ আল্লাহ পাকই একমাত্র প্রশংসা পাওয়ার হকদার। সৃষ্টি করার ও সুষ্ঠ পরিচালনায় যিনি অনন্য। নির্দেশ প্রদান ও নির্ধারনে যিনি অদ্বিতীয়। অতুলনীয় সম্রাট। তাঁহার ন্যায় কাহারও শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি নাই। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁহার কোন মন্ত্রীর প্রয়োজন হয় না। এমন রাজা যাহার রাজ্যের বাইরে ছোট বড় কিছুই নাই। পরিপূর্ণ গুনাবলীর অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁহার কোন সদৃশ ও উদাহরণ নাই। তাঁহার সত্ত্বা এত পরিপূর্ণ যে, ইহার উদাহরণ পর্যন্ত সম্ভব নয়। তিনি মহাজ্ঞানী। কাহারও অন্তরের কথা পর্যন্ত তাঁহার কাছে গোপনীয় নয়। তিনি নিজেই বলেন

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ *

যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি করিয়া জানিবেন না? তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানী সম্যক অবগত।

তিনি এমন জ্ঞানী যে, প্রত্যেক জিনিসের সূচনা ও সমাপ্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ খবর রাখেন। তিনি এমন শ্রোতা যে, তাঁহার সম্মুখে চিৎকার করিয়া বলা এবং চুপে চুপে বলা সমান। উভয় প্রকারের কথা সমভাবে শ্রবন করেন। তিনি রিযিক দাতা। তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে রিযিক দান করেন। তিনি সবকিছুর ধারক। সর্বাবস্থায় তিনি সকলের যিম্মাদার। তিনি স্বীয় পূর্ণ অনুগ্রহের দ্বারা আত্মা সমূহের হায়াতের অস্তিত্ব দিয়াছেন। তিনি সর্বশক্তিমান। স্বীয় পরিপূর্ণ শক্তির দ্বারা সমস্ত মাখলুককে পুনরায় জীবন দান করিবেন। তিনি মহা হিসাব গ্রহণকারী ও যে দিন

তাঁহার সম্মুখে ভাল মন্দ আমল লইয়া উপস্থিত হইবে সে দিন তিনি আমলকারীকে বিনিময় দান করিবেন। ঐ পবিত্র সত্তাই যাবতীয় দোষক্রুটি মুক্ত যিনি বান্দাদের অস্তিত্বের পূর্বেই তাহাদিগকে নিয়ামত দান করিয়াছেন। সর্বাবস্থায় তাহাদিগকে রিযিক দান করেন। বান্দা তাঁহার আদেশ পালন করুক বা না করুক উভয় অবস্থায় তিনি রিযিক পৌঁছাইতে থাকেন। তিনি স্বীয় দয়ায় সমস্ত কিছুকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার অস্তিত্বের সাহায্যে সমস্ত অস্তিত্বশীল টিকিয়া আছে। ভূমণ্ডলে রহিয়াছে তাঁহার হেকমতের প্রকাশ আর আসমানে রহিয়াছে তাঁহার কুদরতের প্রকাশ।

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এই অদ্বিতীয় মহান সত্তা ব্যতীত অন্য কেহ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নহে। কেহই তাঁহার অংশীদার হওয়ার অধিকার রাখে না। আমি একজন তাবেদার ও অনুগত বান্দার ন্যায় সাক্ষ্য দিতেছি। আমি ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসূল। সকল নবীগণ অপেক্ষা তিনি উত্তম। আল্লাহ পাক বিশেষভাবে তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারাই সূচনা করা হইয়াছে। আর তাঁহার দ্বারা সমাপ্ত করা হইয়াছে। অন্য কাহারও মধ্যে এই মর্যাদা নাই। যে দিন বান্দাদের আমলের প্রতিদান প্রদানের ফায়সালা করার জন্য একত্রিত করিবেন সেদিন তিনি সকলের শাফায়াত করিবেন। তাঁহার পবিত্র সত্তার, সকল নবীদের এবং তাঁহার পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবাদের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত অবতীর্ণ হউক।

আম্মাবাদ, হে ভ্রাতা! দোয়া করি আল্লাহ পাক তোমাকে যেন, স্বীয় আশেকদের অন্তর্ভুক্ত করেন; স্বীয় নৈকট্য নসীব করেন; স্বীয় আশেকদের মহব্বতের স্বাদ গ্রহণ করান; তোমাকে স্বীয় সান্নিধ্যে রাখিয়া বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি থেকে নির্ভয় করিয়া দেন; তিনি যেন তোমাকে এমন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাহাদেরকে তিনি ইসলামের দৌলত দ্বারা সৌভাগ্যশালী করিয়াছেন; তাহারা এমন বান্দা যে যখন তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে আল্লাহ পাককে চর্ম চোখে দেখা সম্ভব হইবে না। তখন তাহারা ভগ্ন হৃদয় হইয়া গেলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক তাহাদের সান্তনা প্রদানের উদ্দেশ্যে তাহাদেরকে স্বীয় নূরের তাজ্জালী দ্বারা সৌভাগ্যশালী করিয়াছেন। তাহাদের জন্য স্বীয় নৈকট্যের বাগানের দরজা প্রশস্ত করিয়া তাহাদের অন্তরের উপর দিয়া স্বীয় নৈকট্যের সুরভি পবন প্রবাহিত করিয়াছেন। তাহাদিগকে আবহমান কাল থেকে নির্ধারিত তাকদীর প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। তাহারাও নিজেদের এখতিয়ার পরিপূর্ণভাবে তাঁহার কাছে সোপর্দ করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ পাক তাহাদের সামনে প্রকাশ

করিয়া দিয়াছেন যে তাঁহার কাজ করার মধ্যে তাঁহার অনুগ্রহ ও মেহেরবানী লুকায়িত রহিয়াছে। ইহা অবগত হওয়ার পর তাহারা ঝগড়া-বিবাদ ও হিংসা-দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ পাকের নির্দেশের অনুগত হইয়াছেন। সর্বকার্যে সর্বক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি নির্ভর করা শুরু করিয়া দিয়াছেন। কেননা, তাহারা অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের মর্যাদায় তখনই উন্নীত হইতে পারিবেন যখন তাঁহার নির্দেশের প্রতি রাজী থাকিবেন।

তাহারা ইহাও জানিয়াছেন যে, তাঁহার খালেছ বান্দা হওয়া তখনই সম্ভব হইবে যখন তাকদীরকে মানিয়া লইবেন। সুতরাং এই প্রকারের বান্দা সর্বপ্রকার (আকিদাগত ও আমলী) ময়লা অবর্জনা ও ধুলিবালি হইতে মুক্ত থাকে। এই সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেন-

"বিপদাপদ তাহাদের পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছিবে? যখন তাহারা তাঁহার রশি ধরিয়া রাখিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ পাকের হুকুম জারী হয়। তাহারা তাঁহার আযমতের সামনে অবনত থাকে এবং তাঁহার হুকুমের সামনে মস্তক অবনত থাকে যেন তাঁহার নিয়ন্ত্রন জারী রয়েছে উপর তোমার; ফলে অন্তর নত করিয়া দিয়াছে শির তোমার।"

যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে পৌঁছিতে চায় নিঃসন্দেহে তাহার জন্য অপরিহার্য হইল সে যেন দরজা দিয়া আসে। (দরজা হইল তাকদীর) আর পৌঁছার পাথেয় প্রস্তুত করে। এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিতাজ্য ও বর্জনীয় বিষয় হইল উপায় অবলম্বন করা। কেননা উপায় অবলম্বন করা প্রকৃতপক্ষে তাকদীরেরই মোকাবিলা করা। সুতরাং এই বিষয়টি বর্ণনা করার জন্য এবং ইহাতে যাহা কিছু আছে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য আমি এই গ্রন্থটি রচনা করিয়াছি। আর ইহার নাম রাখিয়াছি "তানবীর ফি এসকাতিত তাদবীর" [১] যাহাতে গ্রন্থের নাম ইহাতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সাথে খাপ খাইয়া যায়। আল্লাহ পাকের কাছে কায়মনবাক্যে আবেদন এই যে, তিনি যেন গ্রন্থ রচনায় পরিপূর্ণ ইখলাস নসীব করেন, স্বীয় অনুগ্রহের দ্বারা ইহাকে কবুল করেন এবং মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উসিলায় বিশেষ বিশেষ লোকদিগকে ও সর্বসাধারণকে উপকৃত করেন।

তিনি সবকিছুর উপর শক্তি রাখেন। কবুল করার যোগ্যতা তাঁহারই আছে। আল্লাহ পাক কুরআনে বলিয়াছেন, আপনার প্রতিপালকের শপথ, তাহারা ঈমানদার হিসাবে গণ্য হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা আপনাকে (হে

১। উপায় অবলম্বন পরিত্যাগ করার সৌন্দর্য আলোকিত করা।

মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের মধ্যে ন্যায় বিচারক বলিয়া মনে না করে। অতঃপর আপনার ফয়সালার উপর নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাইবে না তাহা কায়মনবাক্যে গ্রহণ করিয়া লইবে।[১]

আল্লাহ পাক আরও বলিয়াছেন "আপনার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। মাখলুকের কোন ক্ষমতা নাই। আল্লাহ পাক মুশরিকদের শিরক হইতে পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে।[২]

আল্লাহ পাক অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন, তবে কি মানুষের প্রতিটি আকাঙ্খা পুরা হয়? সুতরাং দুনিয়া ও আখেরাত আল্লাহর জন্যই।"[৩]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ পাককে প্রতিপালক মানিয়া লইয়া, ইসলামকে দ্বীন মানিয়া লইয়া আর মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী মানিয়া লাইয়া রাজী আছে। সে ঈমানের স্বাদ পাইয়াছে।"

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, "আল্লাহর প্রতি রাজী থাকিয়া ইবাদত কর। যদি রাজী থাকার সামর্থ না হয় তাহা হইলে অপছন্দনীয় বিষয়ের উপর ধৈর্যধারণ করার মধ্যেও প্রচুর মঙ্গল রহিয়াছে।"

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছ ব্যতীত আরও অনেক আয়াত ও হাদীছ রহিয়াছে যাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপায় অবলম্বন পরিত্যাগ করার এবং তাকদীরের মোকাবিলা না করার প্রমাণ বহন করে। তবে আহলে মারেফাত বলেন, "যে ব্যক্তি উপায় অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়াছে- তাহার উপায় এই দিক থেকেই হইয়া থাকে।" শায়খ আবুল হাসান শাযলী (রহঃ) বলেন, যদি একান্তই উপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহা হইলে এই উপায় অবলম্বন কর যে, উপায় অবলম্বন ছাড়িয়া দাও। তিনি আরও বলিয়াছেন, কোন কার্যে নিজের পছন্দের দখল দিও না। বরং নিজের পছন্দ বর্জন করা পছন্দ কর। স্বীয় পছন্দ থেকে পলায়ন কর। (দূরে থাক) এই পলায়ন হইতেও বরং এক কথায় সব কিছু হইতে পলায়ন করিয়া আল্লাহ পাকের দিকে ধাবিত হও। তোমার প্রভু যাহা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন আর যাহা ইচ্ছা করেন পছন্দ করেন।

১। فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا تجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما *

২। و ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحن الله و تعالى عما يشركون *

৩। للانسان ما تمنى فالله الاخرة و الاولى *

প্রথম আয়াত অর্থাৎ

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ *

দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রকৃত ঈমান ঐ ব্যক্তির অর্জিত হইয়াছে, যে আল্লাহ পাক ও তদীয় রাসূলকে নিজের জন্য হাকীম মানিয়া লইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার কথায় কাজে, অবলম্বন করা ও বর্জন করার ক্ষেত্রে, ভালবাসা ও শত্রুতার ক্ষেত্রে, প্রভৃতিতে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে ফয়সালাকারী নির্ধারন করিয়াছে। আহকামে তাকলিফী ও আহকামে তাছরিফী উভয় আল্লাহ পাকের এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত। উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের অনুসরণ ও তাহাদের ফয়সালা মানিয়া লওয়া একান্ত অপরিহার্য ও ওয়াজিব।

আহকামে তাকলিফী বলিয়া ইবাদত সম্পর্কিত করণীয় ও বর্জনীয় কার্যসমূহকে বুঝানো হইয়াছে। আর আহকামে তাছরিফী বলিয়া এমন সব বিষয়কে বুঝানো হইয়াছে যাহা স্বীয় উদ্দেশ্য ও চাহিদার পরিপন্থী হইয়া থাকে।

সুতরাং ইহা হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, দুইটি বিষয়ের মাধ্যমে প্রকৃত ঈমান অর্জিত হয়। এক- তাঁহার হুকুম মানা। দুই- তাঁহার পরাক্রমের সামনে নত শির হইয়া যাওয়া। অতঃপর আল্লাহ পাক এতটুকুতেই ক্ষান্ত হন নাই যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুম মানিয়া লইতে পারে নাই কিংবা সংকীর্ণ মনে মানিয়াছে তাহার ঈমান নাকচ করিয়াছেন বরং এই নাকচ করিতে গিয়া নিজের সেই রবুবিয়তের শপথ করিয়াছেন যাহা বিশেষভাবে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পৃক্ত। কেননা এখানে তিনি فلا و الرب (প্রতিপালকের কসম) না বলিয়া فلا و ربك (আপনার প্রতিপালকের কসম) বলিয়াছেন।

এইরূপ বলার দ্বারা কৃত শপথ এবং যে বিষয় সম্পর্কে শপথ করা হইয়াছে উভয় মজবুত ও শক্তিশালী হইয়াছে।

অধিকন্তু আল্লাহ পাকের এই বাণীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা উদ্ভাসিত হইয়া পড়িয়াছে। কেননা, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুমকে নিজের হুকুম আর তাঁহার ফয়সালাকে নিজের ফয়সালা বলিয়া অভিষিক্ত করিয়াছেন। তাই তাঁহার (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুকুম মান্য করা এবং তাঁহার অনুগত হওয়া বান্দাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। এমনকি যতক্ষন পর্যন্ত তাঁহার (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুকুম মান্য না করিবে ততক্ষণ

পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি আনীত ঈমানও গ্রহণযোগ্য হইবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। কেননা তাঁহার (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না; বরং যাহা বলেন তাহা ওহী ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সুতরাং তাঁহার (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুকুম আল্লাহ পাকেরই হুকুম। তাঁহার ফয়সালা আল্লাহ পাকেরই ফয়সালা। যেমন কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে, "যাহারা আপনার হাতের উপর বয়য়াত করে; তাহারা আল্লাহর হাতেই বয়য়াত করিতেছে।" ১

ইহাকে আরও মজবুত করার জন্য বলিয়াছেন "আল্লাহ পাকের হাত তাহাদের হাতের উপর।" আয়াতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা ও অতীব গুরুত্বের প্রতি দ্বিতীয় আর একটি ইঙ্গিত রহিয়াছে। তাহা হইল এই যে, فلا و ربك বলিয়া আল্লাহ পাক স্বীয় সত্ত্বাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পর্কিত করিয়াছেন। অন্য আয়াতে আসিয়াছে

كهيعص * ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا *

অত্র আয়াতেও আল্লাহ পাক স্বীয় পবিত্র নামকে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পর্কিত করিয়াছেন। আর যাকারিয়া (আঃ)-এর পবিত্র নামকে স্বীয় নামের সাথে সম্পর্কিত করিয়াছেন। এইরূপ করিয়াছেন যাহাতে বান্দাগণ উভয়ের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে। অতঃপর মুসলমান হওয়ার জন্য শুধু বাহ্যিকভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফয়সালাকারী মানিয়া লওয়াকে যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; বরং তাহার ফয়সালার ব্যাপারে অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা স্থান না দেওয়াকে শর্ত হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ফয়সালা তাহাদের চাহিদার অনুকূলে হউক বা প্রতিকূলে হউক উভয় অবস্থায় ফয়সালা সম্পর্কে অন্তর সংকীর্ণতামুক্ত জরুরী। অন্তর সংকীর্ণ হওয়ার কারণ হইল অন্তর নূর থেকে খালি হওয়া এবং আবর্জনা ও ময়লাযুক্ত হওয়া। মুমিন ব্যক্তি এমন হয় না; কেননা মুমিনের অন্তর ঈমানের নূর দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। সুতরাং তাহাদের অন্তরে প্রশস্ততা থাকে। প্রশস্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাকের নূর তাহাদিগকে প্রশস্ত অন্তরওয়ালা বানাইয়াছেন। আল্লাহ পাকের অশেষ অনুগ্রহ তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে। ফলে তাহারা তাঁহার আহকামকে মানিয়া লইতে সদা প্রস্তুত এবং সর্বাবস্থায় তাঁহার মতের প্রতি রাজী।

১। ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله *

ফায়দা ঃ আল্লাহ পাক যখন কোন বান্দাকে দ্বারা স্বীয় হুকুম পালন করানোর ইচ্ছা করেন তখন তাহাকে স্বীয় নূরের দ্বারা হুকুম পালনের যোগ্যতার পোশাক পরিধান করান। সুতরাং আল্লাহর হুকুম নাযিল হয় পরে। আর ইহার পূর্বে নাযিল হয় নূর। এই নূরের দ্বারা সেই ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর একান্ত হইয়া যায়। নিজের থাকে না। ফলে সে হুকুমের ভর ও কষ্ট সহ্য করার ক্ষেত্রে শক্তিমান ও ধৈর্যশীল হইয়া যায়।

মোটকথা (১) নূর অবতীর্ণ হইতে থাকে আর নূরের অবতরণের প্রভাবে তাকদীরে লিপিবদ্ধ বিষয়সমূহ বান্দার জন্য সহনীয় হইয়া উঠে। (২) অথবা বিষয়টি এইভাবে বুঝা যাইতে পারে যে, বান্দার অনুধাবন শক্তিই বান্দার সামনে আহকামসমূহকে গ্রহণীয় করিয়া তোলে। (৩) অথবা ইহাকে এইভাবে বুঝা যাইতে পারে যে, অনুগ্রহ অবতীর্ণ হইতে থাকে। ফলে তাকদীরে লিপিবদ্ধ আহকামসমূহ পালনে যে বাঁধা-বিঘ্ন ও বিপদাপদ সামনে আসে তাহা অনুগ্রহের প্রভাবে উঠিয়া যায়। (৪) অথবা মনে কর যে, আল্লাহর উত্তম মনোনয়ন প্রত্যক্ষ করিয়া তাকদীরের বোঝা বহন করিয়া লয়। (৫) আল্লাহ পাক সবকিছু এই বিশ্বাস তাঁহার হুকুম পালনে বান্দাকে ধৈর্যশীল করিয়া তোলে। (৬) অথবা ইহা এইভাবে বলা যায় যে, যখন বান্দা একীন করে যে, আল্লাহ পাক তাহার সবকিছু দেখিতেছেন তখন তাহার সাথে সম্পর্কিত ঘটনাসমূহে তাহার ধৈর্য আসিয়া পড়ে। (৭) অথবা এইভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ পাকের সৌন্দর্যের প্রকাশ বান্দাকে স্বীয় আমলের ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল করিয়া তোলে। (৮) অথবা বিষয়টি এভাবেও বুঝা যায় যে, বান্দা যখন বিশ্বাস করে যে, ধৈর্যধারণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায়। তখন তাহার মধ্যে ধৈর্য আসিয়া পড়ে। (৯) অথবা বিষয়টি এইভাবে বুঝা যাইতে পারে যে, বান্দার আন্তরিক দর্শনের পর্দা উঠিয়া যাওয়ার ফলে বান্দা ধৈর্যশীল হইয়া পড়ে। (১০) অথবা এইভাবে বলা যায় যে, আহকামের ভেদ ও রহস্যসমূহ জ্ঞাত হওয়ার ফলে বান্দার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, বান্দা আহকাম পালনের বোঝা বহন করার ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল হইয়া পড়ে। (১১) অথবা ইহা এইভাবে বুঝিয়া লওয়া যায় যে, যখন বান্দা জানিতে পারে যে, স্বীয় প্রভুর আহকাম পালনে প্রভুর অনুগ্রহ ও করুনা নিহিত রহিয়াছে। তখন সে আহকাম পালনে আগ্রহী ও ধৈর্যশীল হইয়া উঠে।

প্রথম সবব (উপায়)

নূরের অবতরণ তাকদীরকে সহনীয় করিয়া দেয়। ইহা এইভাবে হয় যে, যখন নূর অবতীর্ণ হইতে থাকে তখন আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিষয়টি বান্দার সামনে খুলিয়া যায়। আর সে জানে যে এই সব আহকাম তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে আসিয়াছে। আহকাম প্রভুর পক্ষ হইতে আসার অবগতি তাহার জন্য সান্তনার ও ধৈর্যধারণের কারণ হইয়া যায়। আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়াছেন "আপনি স্বীয় পরোয়ারদিগারের হুকুমের উপর ধৈর্যধারণ করুন। কেননা, আপনি তো আমার চোখের সামনে রহিয়াছেন।"[১]

অর্থাৎ ইহা অন্য কাহারও হুকুম নহে যে আপনার জন্য কষ্ট হইবে। বরং ইহা আপনার প্রভুর হুকুম। আপনার প্রতি তো তাঁহার ইহসান অনুগ্রহ রহিয়াছে। এই বিষয়ের উপর আমাদের কবিতাঃ

سبك هوگيا پجو كرجو كجهو تها غم و بلا

سناجب سے هے تم نے كيا لجو كو مبتلا

هنين حكم حق ے آدمى كو كهين پناه

نهين چلتا بش هين پر جو خود

"আমার যে সব চিন্তা ভাবনা ও বিপদাপদ ছিল তাহা হালকা হইয়া গিয়াছে। যখন থেকে আমি শুনিয়াছি যে, আপনি আমাকে জড়িত করিয়াছেন।

"আল্লাহর হুকুম থেকে মানুষের রেহাই নাই। তিনি নিজে যাহা মনোনীত করিয়াছেন তাহা না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া চলে না।"

বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমেও বুঝা যাইতে পারে যেমন, এক ব্যক্তি একটি অন্ধকার কক্ষে আছে। কোন একটি জিনিস তাহার দেহে পড়িল কিন্তু কে তাহা নিক্ষেপ করিল সে তাহা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু বাতি জ্বালানোর পর যখন দেখিতে পাইল যে, এই ব্যক্তি তাহার পীর অথবা পিতা অথবা হাকীম। এই সময়ে তাহার এই ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া তাহার ধৈর্য ও সান্ত্বনার কারণ।

দ্বিতীয় সবব ঃ অনুধাবনের দরজা প্রশস্ত হইয়া যাওয়া আহকাম কবুল করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। আল্লাহ পাক যখন স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে

১। و اصبر لحكم ربك فانك باعيننا *

কাহারও প্রতি হুকুম আপতিত করিতে ইচ্ছা করেন এবং অনুধাবনের দরজা খুলিয়া দেন। তখন তিনি উক্ত বান্দাকে বলিয়া দেন যে, আল্লাহ পাক তাহার এই হুকুমটি কবুল করিতে চাহিতেছেন। ইহা এইভাবে হয় যে, অনুধাবন তোমাকে আল্লাহর দিকে লইয়া যায়। তাঁহার দিকে চলার দিকে উৎসাহিত করে। তাঁহার প্রতি তাওয়াক্কুল করাইয়া দেয়। আল্লাহ পাক বলেন,

و من يتوكل على الله فهو حسبه *

"যে আল্লাহর উপর ভরসা করে। আল্লাহই তাহার জন্য যথেষ্ঠ।" অন্যের মোকাবিলায় আল্লাহ পাক তাহাকে সাহায্য করেন। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। আল্লাহর পক্ষ হইতে বান্দা যে অনুধাবন শক্তি লাভ করে তাহা বান্দার সামনে বন্দেগী ও ইবাদতের রহস্য খুলিয়া দেয়। তাহার দাসত্বের হেকমত তাহার সামনে খুলিয়া যায়। আল্লাহ পাক স্বীয় দাসত্বের সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ কি স্বীয় বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নয়? অবশিষ্ট দশটি সববের সারকথাও এই অনুধাবন। আর অবশিষ্ট সববসমূহ ইহার প্রকার ভেদ।

তৃতীয় সবব ঃ আল্লাহর পক্ষ হইতে অনুগ্রহ ও দান অবতীর্ন হওয়া বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ক্ষেত্রে সহায়ক ও সাহায্যকারী হইয়া থাকে। ইহা এইভাবে হইয়া থাকে যে, পূর্বেই তোমার প্রতি আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ ও নিয়ামত অবতীর্ণ হইয়াছে। এইগুলি স্বরণ করা আল্লাহ পাকের আহকাম কবুল করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। কেননা, তিনি তোমাকে প্রিয় নিয়ামত দান করিয়াছেন। সুতরাং তোমার ও তাঁহার প্রিয় হুকুমের প্রতি ধৈর্যধারণ করা অর্থাৎ তাহা পালন করা উচিত। (সুতরাং এই নীতির অনুসরণ) করিলে আহকাম পালন করা সহজতর হইয়া পড়ে)

যেমন আল্লাহ পাক ওহুদের যুদ্ধে আহত সাহাবাদের সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন,

اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا *

"তবে কি যখন তোমাদের বিপদ পৌঁছিয়াছে তোমরাও ইতিপূর্বে বর্তমান বিপদের দ্বিগুণ পৌঁছাইয়াছ।" আল্লাহ পাক তাহাদের বিপদের সময় সান্ত্বনা দিয়াছেন এমন একটি নিয়ামত উল্লেখ করিয়া যাহা পূর্বেই তাহাদের অর্জিত হইয়াছিল।

আবার কখনও কখনও বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার সময় আল্লাহর পক্ষ হইতে এমন জিনিস আসিয়া উপস্থিত হয় যাহা আল্লাহর মকবুল বান্দাদের জন্য বিপদাপদ হালকা করিয়া দেয়। তন্মধ্যে একটি হইল অবতীর্ণ বিপদের সময়

ধৈর্যধারণ করিলে অনেক সওয়াব অর্জিত হয়।

এই বিশ্বাস বান্দার বিপদ হালকা করিয়া দেয়। তন্মধ্যে আরও একটি হইল, বান্দার বিপদের সময় তাহার অন্তরে ধৈর্যধারণ ও অটল থাকিবার যোগ্যতা ঢালিয়া দেওয়া হয়। তন্মধ্যে আরও একটি হইল এই যে, বিপদগ্রস্থ বান্দার অন্তরে বিপদাপদ সহ্য করার স্বাদের রহস্যগুলি খুলিয়া দেওয়া হয়। এমনকি অসুস্থ অবস্থায় কোন কোন সাহাবা কেরাম দোআ করিতেন-

তাহাদের অসুস্থতার কষ্ট যেন আরও শক্ত করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন আরিফ বলিয়াছেন- 'আমি একবার অসুস্থ হইয়াছি। আমি চাহিতেছি যে, আমার অসুস্থতা যেন না সাড়ে। কেননা, এই অবস্থায় আমার প্রতি আল্লাহর নেয়ামত অবতীর্ণ হইয়াছে। অদৃশ্যের বিষয়সমূহ আমার সামনে খুলিয়া আসিয়াছে।'

চতুর্থ সবব ঃ আল্লাহ পাক বান্দার জন্য মঙ্গলজনক পক্ষ অবলম্বন করেন। বান্দার এই বিশ্বাস তাহার তাকদীরে লিখা বিষয়সমূহ সহ্য করার প্রতি শক্তি যোগায়। ইহা এইভাবে হয় যে, বান্দা যখন তাহার জন্য আল্লাহ পাকের মঙ্গলজনক পন্থা অবলম্বন করা প্রত্যক্ষ করে তখন তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তিনি বান্দাদের দুঃখ দিতে চান না। কেননা তিনি তাহাদের প্রতি সীমাহীন মেহেরবান। তিনি নিজেই বলেন-

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا *

'তিনি মুমিনদের প্রতি পরম করুনাময়।'

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুসহ এক মহিলাকে দেখিয়া সাহাবাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের কি ধারণা হয় যে, এই মহিলা স্বীয় শিশুকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে পারিবে? উপস্থিত সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে তাহা করিতে পারে না। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই মহিলার স্বীয় শিশুর প্রতি যতটুকু মহব্বত রহিয়াছে বান্দাদের প্রতি আল্লাহ পাকের আরও অনেক বেশী মহব্বত রহিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও তিনি কখনও কখনও তোমাদের দুঃখ দিয়া থাকেন। তখন তাঁহার উদ্দেশ্য হয় তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও ইহসান করা।

তোমরা কি আল্লাহ পাকের ইরশাদ শুন নাই যে, আল্লাহ পাক বলেন, "ধৈর্যধারণকারীদিগকে অগণিতভাবে পুরাপুরি বিনিময় দেওয়া হইবে।"[১]

(১) انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب *

যদি আল্লাহ পাক বান্দাদের নিজের নিয়ন্ত্রনে না রাখিয়া তাহাদিগকে তাহাদের নিয়ন্ত্রণে সোপর্দ করিতেন, তাহা হইলে বান্দারা আল্লাহ পাকের ইহসান ও অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িত।[১] আল্লাহ পাকের ইহসান ও অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হওয়ার কারণে বেহেশতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিত না। সুতরাং আল্লাহপাক বান্দাদের নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া তাহাদের জন্য সর্বক্ষেত্রে মঙ্গলজনক পক্ষ অবলম্বন করার কারণে তাঁহার শুকরিয়া আদায় করিতেছি।

তোমরা কি আল্লাহ পাকের ইরশাদ শুন নাই যে, আল্লাহ পাক বলিতেছেন, 'হয়ত বা কোন বিষয় তোমাদের কাছে অপছন্দ অথচ তাহা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক এবং হয়তবা কোন বিষয় তোমাদের কাছে খুবই পছন্দ অথচ তাহা তোমাদের জন্য অনষ্টিকর।'

আল্লাহ পাক বান্দাকে দুঃখ দেওয়া সত্ত্বেও তাহার জন্য মঙ্গলজনক পন্থা অবলম্বনের উদাহরণ; পিতা ও পুত্রের উদাহরণ। পিতা পুত্রের প্রতি দয়াশীল হয়। পুত্রের প্রতি তাহার অজস্র দয়া থাকা সত্ত্বেও পুত্রের দেহের ফোঁড়া কাটার জন্য বৈদ্য ডাকিয়া আনে। বৈদ্য ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার ফোঁড়া কাটিয়া দেওয়ার দ্বারা পুত্রকে কষ্ট দেওয়া পিতার উদ্দেশ্য হয় না। বরং তাঁহার কল্যাণ করা উদ্দেশ্য হয়। অনুরূপভাবে মঙ্গলকামী কোন চিকিৎসক তোমাকে তেজ প্রভাব মলম ব্যবহার করিতে দিয়া দুঃখ দেয়। ইহাতে যদিও তোমার কষ্ট হয় কিন্তু ইহাতে তোমার কল্যাণই হইয়া থাকে। যদি এই চিকিৎসক তোমার মতের অনুসরণ করে তাহা হইলে সুস্থতা আর চোখে দেখিবে না। যদি কাহাকেও কোন বস্তু না দেওয়া হয় আর সে জানে যে, তাহাকে ভালবাসে বলিয়া তাঁহার কল্যাণের দিকে খেয়াল করিয়া তাহাকে দেওয়া হয় নাই। তাহা হইলে তাহাকে না দেওয়াই দেওয়া হইল। যেমন; দয়াময়ী মাতা স্বীয় শিশুকে অধিক খাইতে দেয় না শিশুর বদ হজমের আশংকা করিয়া।

শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, জানিয়া রাখ যে, যদি আল্লাহ পাক তোমাদিগকে কোন কিছু না দেন, তাহা হইলে তাহার এই না দেওয়াটা তাঁহার কৃপণতা নয় বরং ইহা তাঁহার রহমত।

১। কেননা, তখন হয়ত বান্দা নিজের এখতিয়ারে কাজ করিত। আর কার্যে ভুলত্রুটি হওয়ার কারণে দুঃখ-কষ্টে পতিত হইত। ফলে দুঃখ কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহর ইহসান ও অনুগ্রহ লাভ হইত না। কিন্তু যদি আল্লাহ নিজে দুঃখ-কষ্টে ফেলেন তাহা হইলে ইহার বিনিময়ে ইহসান ও অনুগ্রহ লাভ করিবে। (অনুবাদক)

সুতরাং আল্লাহ পাকের না দেওয়াই দেওয়া। কিন্তু না দেওয়াকে দেওয়া বলিয়া ঐ ব্যক্তি বুঝিতে পারিয়াছে, যে খালেছ বিশুদ্ধ হইতে পারিয়াছে। আমরা অন্য এক গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছি যে, যখন কোন ব্যক্তি বুঝে যে, আল্লাহ পাক তাহাকে কোন বিপদে জড়িত করিয়াছেন তখন তাহার বিপদে জড়িত হওয়ার কষ্ট কমিয়া যায়। সুতরাং যে সত্ত্বার পক্ষ হইতে তোমার প্রতি তাকদীর সম্পর্কিত হুকুমগুলি আসিয়াছে তিনিই তো ঐ সত্ত্বা যিনি তোমার সম্পর্কে কল্যাণকর পন্থা অবলম্বন করেন।

পঞ্চম সবর ঃ আল্লাহ সবকিছু দেখেন। বান্দার এই বিশ্বাস আল্লাহর হুকুম পালন করার ক্ষেত্রে বান্দাকে ধৈর্যশীল বানাইয়া তোলে। ইহা এইভাবে হয় যে, বান্দা যখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ পাকই তাহাকে বিপদে ফেলিয়াছেন এবং আল্লাহ পাক তাঁহার এই অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন, তখন তাঁহার বিপদের বোঝা অবশ্যই হালকা হইয়া যায়। তোমরা কি আল্লাহ পাকের ইরশাদ শোন নাই যে, আল্লাহ পাক বলেন, "স্বীয় পরোয়ারদিগারের হুকুমের উপর ধৈর্যধারণ করুন। কেননা আপনি আমাদের (আল্লাহর) সামনে আছেন।" [১]

অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কুরায়েশ কাফেররা আপনার প্রতি হিংসাত্মক কার্যকলাপ করিয়াছে; আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করিয়াছে। তাহা আমার অজানা নয়। এক ব্যক্তি সম্পর্কে একটি ঘটনা রহিয়াছে যে, তাহাকে নিরানব্বইটি বেত্রাঘাত করা হইয়াছে কিন্তু সে উহঃ পর্যন্ত বলিল না। যখন পরে আর একটি বেত্রাঘাত করিয়া শত পুরা করা হইল তখন উহঃ করিয়া উঠিল। কোন এক ব্যক্তি এইরূপ আচরণের কারণ সম্পর্কে জানিতে চাহিলে সে জবাব দিল যে, যাহার কারণে আমাকে প্রহার করা হইতেছিল, নিরানব্বইটি বেত্রাঘাত করা পর্যন্ত সে দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া আমাকে দেখিতেছিল। তাই আমি ব্যথা অনুভব করিতেছিলাম না। কিন্তু সর্বশেষ বেত্রাঘাতটি করার পূর্বে সে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তাই আমি শেষ বেত্রাঘাতে ব্যথা অনুভব করিতেছিলাম।

ষষ্ঠ সবব ঃ আল্লাহ পাকের সৌন্দর্যের প্রকাশ তাঁহার কর্মের উপর ধৈর্যশীল বা অবিচল বানাইয়া দেয়। ইহা এইভাবে যে, বান্দার প্রতি কোন তিক্ত বিপদ আপতিত হওয়ার সময় আল্লাহ পাক যখন তাজাল্লী (জ্যোতি) অবতরণ করেন তখন তাজাল্লীর স্বাদে তাঁহার কর্মের কষ্ট দূর হইয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাজাল্লীর অধিক্যতার কারণে কষ্টদায়ক কর্মের কষ্ট পর্যন্ত অনুভূত হয় না।

---

(১) و اصبر لحكم ربك فانك باعيننا *

বিষয়টি বুঝিবার জন্য হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কিত আয়াতটিই যথেষ্ঠ। "যখন নারীরা ইউসুফকে দেখিল; তাহারা তাঁহার বড়ত্ব বর্ণনা করিল এবং নিজেদের হাত কাটিয়া ফেলিল।"

সপ্তম সবব ঃ ধৈর্য ধারণের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়। বান্দার এই বিশ্বাস তাহাকে আল্লাহর ফয়সালা গ্রহন করার ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল করিয়া তোলে অর্থাৎ দেহমনে প্রস্তুত করিয়া তোলে। ইহা এইভাবে হয় যে, আল্লাহর প্রদত্ত আহকামের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা অর্থাৎ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাহা পালন করা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ হয়। সুতরাং অন্তর যখন এমন হইয়া পড়ে, তখন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চাহিদা শক্ত আহকামকে সহ্য করিয়া লয়। যেমন, রোগ মুক্তির আশায় তিক্ত ঔষধও পান করিয়া থাকে।

অষ্টম সবব ঃ পর্দাসমূহ উঠিয়া যাওয়ার ফলে বান্দা তাকদীরের উপর ধৈর্যশীল হইয়া পড়ে। ইহা এইভাবে হয় যে, আল্লাহ পাক যখন কোন বান্দার উপর অপতিত বিপদাপদ সরাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁহার আন্তরিক দর্শনের পর্দা উঠাইয়া দেন এবং তাহাকে নিজের নৈকট্য দেখাইয়া দেন। অতঃপর নৈকট্য তাহার উপর এত প্রভাব বিস্তার করে যে, বিপদাপদের কষ্ট পর্যন্ত অনুভূত হয় না।

যদি আল্লাহ পাক জাহান্নামীদের উপর স্বীয় সৌন্দর্যের জ্যোতি বিচ্ছুরিত করেন তখন জাহান্নামীরাও নিজের আযাবকে আযাব বলিয়া মনে করিবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ পাক যখন বেহেশতীদের সামনে পর্দা করিয়া লন; তখন বেহেশতের কোন নেয়ামতও তাহাদের কাছে নেয়ামত বলিয়া মনে হইবে না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আযাব হইল বান্দা হইতে আল্লাহ পাকের পর্দা করিয়া লওয়া। আর বিভিন্ন প্রকার আযাব ইহারই প্রকাশ। বেহেশতের নেয়ামত হইল তাঁহার তাজাল্লীর প্রকাশ। আর বিভিন্ন প্রকার নেয়ামত আল্লাহ পাকের তাজাল্লীরই বিভিন্নরূপ।

নবম সবব ঃ আহকামের রহস্য ও ভেদ খুলিয়া সামনে আসিলে আহকাম পালন করার ক্ষেত্রে শক্তির যোগান হয়। ইহা এইভাবে হয় যে, আহকামের দায়িত্ব অবশ্যই একটি ভারী বোঝা বা কঠিন দায়িত্ব। আহকামের মধ্যে নিম্নোল্লিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত। ১। আহকাম পালন করা। ২। নিষিদ্ধ বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকা। ৩। আহকামের উপর ধৈর্যধারণ করা। ৪। নেয়ামত লাভের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

ইহাদের সাথে চারটি বিষয় সম্পর্কিত রহিয়াছে। যথাক্রমে আনুগত্য,

গোনাহ, বিপদাপদ, নেয়ামত। যেমন আহকাম পালনের সাথে সম্পর্কিত আনুগত্য। নিষিদ্ধ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত গোনাহ। ধৈর্য ধারনের সাথে সম্পর্কিত বিপদাপদ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সম্পর্কিত নেয়ামত। আল্লাহ পাক প্রত্যেক বান্দার প্রতিপালক আর প্রত্যেকে তাঁহার বান্দা। সুতরাং বান্দা হওয়া হিসাবে প্রত্যেকের উপর এই চার বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে আল্লাহ পাকের হক রহিয়াছে। আনুগত্যের ক্ষেত্রে বান্দার দায়িত্বে আল্লাহর হক হইল, বান্দা তাঁহার ইহসান ও অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করিবে। গোনাহের ক্ষেত্রে হক হইল যে, বান্দা যাহা কিছু নষ্ট করিয়াছে সে সম্পর্কে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। বিপদাপদের ক্ষেত্রে বান্দার দায়িত্বে আল্লাহর হক হইল, বান্দা বিপদাপদের সময় ধৈর্যধারণ করিবে। নেয়ামতের ক্ষেত্রে বান্দার দায়িত্বে আল্লাহর হক হইল, বান্দা নেয়ামত পাওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

সুতরাং যখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে, ইবাদতের লাভ তুমি লাভ করিবে, তখন ইবাদতের জন্য দাঁড়াইয়া যাওয়া তোমার জন্য সহজ হইয়া পড়িবে। আর যখন তুমি জানিতে পারিবে যে, গোনাহ করা থেকে সরিয়া না আসা এবং গোনাহে লিপ্ত হওয়া পরকালে আল্লাহ পাকের গোস্বার এবং ইহকালে ঈমানের নূর মিটিয়া যাওয়ার কারণ হইবে, তখনই তুমি গোনাহ পরিত্যাগ করিবে। অনুরূপভাবে যখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে, ধৈর্যধারণের সুফল তুমিই লাভ করিবে আর ইহার বরকত তোমার প্রতি ধাবিত হইবে তখন তুমি অবশ্যই ইহার দিকে দৌড়াইয়া যাইতে থাকিবে। ইহার আশ্রয় তালাশ করিতে থাকিবে। আবার যখন তুমি অন্তরে বিশ্বাস জন্মাইয়া লইবে যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে নেয়ামত বৃদ্ধি পায়। ইরশাদ হইয়াছে-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ *

"যদি তোমরা শোকর কর তাহা হইলে আমি অবশ্যই তোমাদের বৃদ্ধি করিয়া দিব।" উল্লেখিত বিশ্বাস সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এবং ইহার প্রতি অগ্রসর হওয়ার কারণ হইয়া যাইবে। অত্র গ্রন্থের শেষভাগে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিষয় চতুষ্টয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

দশম সবব ঃ আল্লাহ পাক তাকদীর সম্পর্কিত আহকামসমূহে স্বীয় মেহেরবানী ও ইহসান যতটুকু নিহিত রাখিয়াছেন যখন মানুষ ইহা অবগত হইতে পারে তখন তাহার মধ্যে ধৈর্য আসিয়া পড়ে। ইহা এইভাবে হয় যে, অপছন্দনীয় ও মনের চাহিদার পরিপন্থী জিনিস সমূহের মধ্যে আল্লাহ পাক মেহেরবানী ও অনুগ্রহ গচ্ছিত রাখিয়াছেন। তোমরা কি আল্লাহ পাকের ইরশাদ শুনো নাই-

فَعَسٰى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ *

"হয়তোবা কোন জিনিস তোমরা অপছন্দ কর অথচ ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।"

অনুরূপভাবে নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ- "জান্নাত বিস্বাদ জিনিসের দ্বারা আর জাহান্নাম মনের চাহিদার অনুকূল জিনিসের দ্বারা সাজানো হইয়াছে।"

বিপদাপদ, রোগশোক ও ভুখা-ফাকার মধ্যে এতোধিক মেহেরবানী গোপনীয় করিয়া রাখা হইয়াছে যে, সূক্ষ্মদর্শী লোক ব্যতীত অন্য কেহ ইহা বুঝিতে পারে না।

তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে, বিপদাপদের দ্বারা প্রবৃত্তি দমিয়া যায় এবং অপদস্থ হইয়া পড়ে। আর স্বাদ ও মজার জিনিসের দ্বারা প্রবৃত্তি লাফাইয়া উঠে। বিপদাপদের সাথে রহিয়াছে অপদস্থতা। আর অপদস্থতার সাথে রহিয়াছে সাহায্য। আল্লাহ সাহাবীদের সম্পর্কে বলেন-

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ *

"বদরের ময়দানে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল।"

এই সম্পর্কে আর বেশী আলোচনা করিতে গেলে মূল লক্ষ্য হইতে দূরে সরিয়া পড়িব তাই পুনরায় উল্লিখিত আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। আয়াতটি হইল-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ *

আয়াতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার কথা বলা হইয়াছে। ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার অবস্থা তিনটি। ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার পূর্বাবস্থা। ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার সময়ের অবস্থা। ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার পরের অবস্থা। ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার পূর্বাবস্থায় ইবাদত হইল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফয়সালাকারী নির্ধারণ করা। ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার সময় এবং ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার পর ইবাদত হইল অন্তরে কোন রকম সংকীর্ণতা পোষন না করা।

অবশ্য কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার পর

অন্তরে সংকীর্ণতা পোষণ করার কি অর্থ হইতে পারে। কারণ এমন ব্যক্তিকেই ফয়সালাকারী নির্ধারণ করা হয় যাহার সম্পর্কে কোন দ্বিধা সংকোচ থাকে না। সুতরাং ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার পর অন্তর সংকীর্ণতা মুক্ত করার শর্তারোপ করা ঠিক হয় নাই। এই প্রশ্নের জবাব এই যে, ফয়সালাকারী নির্ধারন করার পর অন্তর সংকীর্ণতা ও সন্দেহমুক্ত হওয়া অপরিহার্য নয়। কেননা, কখনও কখনও এমন হয় যে, বাহ্যিক পরিস্থিতির কারণে কাহাকেও ফয়সালাকারী নির্ধারণ করা হয় কিন্তু অন্তরের মধ্যে তাহার প্রতি সন্দেহ বিদ্যমান থাকে। সুতরাং ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার পরও আন্তরিক সংকীর্ণতা মুক্ত হওয়া এবং তাঁহার (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফয়সালা গ্রহণ করা অপরিহার্য শর্ত।

অত্র আয়াত সম্পর্কে আরও একটি আপত্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। তাহা এই যে, অন্তর সংকীর্ণতামুক্ত হইলে তাঁহার ফয়সালা গ্রহণ করিয়া লওয়া তো একান্ত অপরিহার্য। সুতরাং আয়াতে يسلموا تسليما বলার ফায়দা কি? ইহার জবাব এই যে, উল্লিখিত আয়াতাংশে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত বিষয়গুলি যেন গ্রহণ করিয়া লওয়া হয়। এই জবাবের উপরও আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, আয়াতে حتى يحكموك বলার দ্বারাই তো বুঝা গেল যে, তাঁহার সমস্ত বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়া লইতে হইবে। ইহার জবাব এই যে, ইহা হইতে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তাহাকে ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার কথা বুঝা যায় না। কেননা এখানে فيما شجر بينهم (অর্থাৎ যে বিষয়ে তাহাদের ঝগড়া হয়) বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, حتى يحكموك বলিয়া সমস্ত কিছুর ফয়সালাকারী বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং ইহাতে সমস্ত কিছু গ্রহণ করিয়া লওয়ার কথা বুঝা যায় না। তাই সমস্ত কিছু গ্রহণ করার শর্তারোপ করার জন্য يسلموا تسليما বলা হইয়াছে। সুতরাং অত্র আয়াতে তিনটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

১। নিজেদের ঝগড়া বিবাদে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফয়সালাকারী নির্ধারণ করা।

২। তাঁহার ফয়সালায় কোনরূপ সংকীর্ণতা অনুভব না করা।

৩। সর্বক্ষেত্রে তাঁহার কথা মানিয়া লওয়া। অর্থাৎ ঝগড়া বিবাদের ফয়সালার ক্ষেত্রেও আবার নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও তাঁহার কথা মানিয়া লওয়া।

দ্বিতীয় আয়াত

وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ تَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ * [১]

অত্র আয়াতে কয়েকটি বিশেষ ফায়দার কথা রহিয়াছে।

প্রথম ফায়দা ঃ "আপনার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন।" এই আয়াতাংশ থেকে বুঝা যায় যে, বান্দার জন্য অপরিহার্য যে, বান্দা যেন আল্লাহর মোকাবিলায় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে।

কেননা তিনি যখন যাহা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করেন তখনই তাহা সৃষ্টি করেন। সুতরাং যে ব্যবস্থা গ্রহনের ইচ্ছা করিবেন তাহাই করিবেন। ইহার বাধা দেওয়ার কেহই নাই। আর যে সৃষ্টি করিবার মালিক নহে সে ব্যবস্থা গ্রহণেরও মালিক নহে। সুতরাং অন্য কেহ সৃষ্টি করার মালিক নহে বিধায় ব্যবস্থা গ্রহণেরও মালিক নহে। কুরআনে আসিয়াছে "তবে কি যে সৃষ্টি করিতে পারেন আর যে সৃষ্টি করিতে পারে না উভয় সমান?" তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? [২]

আয়াতাংশের দ্বিতীয় কথা "তিনি যাহা ইচ্ছা পছন্দ করেন।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কোন কিছু পছন্দ করা বা মনোনীত করার ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি কোন কাজ করার জন্য বাধ্য নহেন। বরং স্বীয় ইচ্ছা মোতাবেক করার গুনে গুণান্বিত। অত্র আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, বান্দার জন্য অপরিহার্য হইল বান্দা স্বীয় এখতিয়ার ও ব্যবস্থা গ্রহন যেন আল্লাহর এখতিয়ার ও ব্যবস্থা গ্রহণের সামনে রহিত করিয়া দেয়। কারণ আল্লাহ পাকের যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে বান্দার তাহা নাই।

আয়াতের দ্বিতীয়াংশেঃ "তাহাদের কোন এখতিয়ার নাই" ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। এক- কোন প্রকার এখতিয়ার থাকার যোগ্য তাহারা নহে। অধিকন্তু তাহারা ইহার হকদারও নহে। দুই- আমি তাহাদিগকে কোন এখতিয়ার প্রদান করি নাই এবং তাহাদিগকে ইহার যোগ্যও বানাই নাই।

আয়াতের শেষাংশঃ- "তাহারা আল্লাহ পাকের সাথে যে সকল জিনিসকে

১। আয়াতের অনুবাদঃ এবং আপনার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। তাহাদের কোন এখতিয়ার নাই। তাহাদের শিরক থেকে আল্লাহ পাক ও পবিত্র।

২। فمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون * ।

শরীক বলিয়া মান্য করে আল্লাহ পাক উহাদের শরীক হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে।"

অর্থাৎ আল্লাহর সামনে তাহাদের এখতিয়ার চলিবে এমন বিষয় থেকে আল্লাহ পবিত্র। অর্থাৎ আল্লাহর সামনে তাহাদের কোন এখতিয়ার চলিতে পারে না।

অত্র আয়াত থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা গেল যে, কেহ আল্লাহ পাকের সাথে কাহাকেও শরীক বলিয়া দাবী করিলে সে মুশরিক। যদিও সে স্বীয় মুখে প্রতিপালক হওয়ার দাবী করে না। কিন্তু সে নিজের মধ্যে এমন অবস্থা অবলম্বন করিয়াছে যাহা তাহার প্রতিপালক হওয়ার দাবীর প্রমাণ করিতেছে।

তৃতীয় আয়াত– আল্লাহ তাআলা বলেন,

ام للانسان ما تمنى فلله الاخرة و الاولى *

"তবে কি মানুষের সব আকাঙ্ক্ষাই পুরা হয়? সুতরাং আল্লাহর জন্যই আখেরাত ও দুনিয়া।"

অত্র আয়াতে এই প্রমাণ রহিয়াছে যে, আল্লাহর সামনে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ রহিত করিয়া দেওয়া উচিত। কেননা আল্লাহ পাক বলিতেছেন যে, তবে কি মানুষের সকল আকাঙ্খাই পুরা হয় অর্থাৎ এমন হয় না যে, তাহার সকল আকাঙ্খাই পুরা হইবে। আর ইহা তাহার জন্য শোভনীয়ও নয়। কেননা আমি তাহাদিগকে ইহার মালিক বানাই নাই। অতঃপর আল্লাহ পাক এই বিষয়কে স্বীয় ইরশাদ, "আল্লাহরই জন্য আখেরাত ও দুনিয়া" দ্বারা মজবুত ও সুদৃঢ় করিয়াছেন। অর্থাৎ যখন দুনিয়া আখেরাত উভয় আল্লাহর জন্য তখন মানুষের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। সুতরাং তাহার জন্য উচিত নহে যে, অন্যের রাজত্বে সে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বরং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার ঐ সত্তারই রহিয়াছে; যিনি উভয় স্থানের মালিক। আর সে মালিক একমাত্র আল্লাহ পাক।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাককে প্রতিপালক মানিয়া, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল গ্রহণ করিয়া খুশী হইয়াছে সে ঈমানের স্বাদ পাইয়াছে।

এই হাদীছ প্রমাণ করিতেছে যে, সকল গুন ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয় এমন ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ ও মজা পাইবে না। তাহার ঈমান ছবি সমতুল্য,

প্রাণহীন। বাহ্যিক, অর্থহীন। কাগজের ফুলের ন্যায়। এই হাদীছে এই ইঙ্গিতও রহিয়াছে যে, যে সকল অন্তর গাফিলতির ও প্রবৃত্তির অনুসরণের রোগ হইতে নিরাপদ, সে সকল অন্তর ঈমানের মজা লুটিতেছে। যেমন মজাদার খাদ্য দ্বারা মানবন্তর খুশী হয়। সুখ অনুভব করে। ইহাও তদ্রূপ। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাককে স্বীয় প্রতিপালক মানিয়া লইয়াছে সেই ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে। কেননা যখন আল্লাহকে প্রতিপালক হিসাবে মানিয়া লইবে তখন তাঁহার সামনে গর্দান ঝুঁকাইয়া দিবে। তাহার নির্দেশের অনুগত হইবে। স্বীয় ক্ষমতা তাঁহার কাছে সমর্পণ করিবে। তাঁহার ব্যবস্থা গ্রহণের সময় নিজের ব্যবস্থা এখতিয়ার পরিত্যাগ করিবে। তখন সে জিন্দেগীর মজা ও আল্লাহর সামনে স্বীয় এখতিয়ার সোপর্দ করার আরাম দেখিতে পাইবে।

যখন আল্লাহকে প্রতিপালক মানিয়া লইয়া সন্তুষ্ট হইবে তখন আল্লাহর পক্ষ হইতেও সন্তুষ্টি পাওয়া যাইবে। যেমন আল্লাহ পাক বলিয়াছেন

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ *

"আল্লাহ পাক তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে আর তাহারাও আল্লাহ পাকের প্রতি সন্তুষ্ট।"

যখন আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হন তখন তিনি বান্দার মধ্যে স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা সৃষ্টি করেন যাহাতে সে আল্লাহ পাকের ইহসান অনুগ্রহ সম্পর্কে জানিতে পারে। আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া বোধ উদয় ব্যতীত হইতে পারে না। নূর ব্যতীত বোধ উদয় হয় না। আল্লাহর নৈকট্য লাভ ব্যতীত নূর লাভ হয় না। আর আল্লাহর রহমত ব্যতীত নৈকট্যও লাভ হয় না। সুতরাং যখন বান্দার দিকে আল্লাহর রহমত ঝুঁকিয়া পড়ে তখন তাঁহার ইহসান ও অনুগ্রহের ভাণ্ডার হইতে সর্বপ্রকার দৌলত বান্দার জন্য প্রকাশ হইতে থাকে।

সুতরাং আল্লাহ পাকের সাহায্য ও নূর যখন বান্দার প্রতি অনবরত আসিতে থাকে তখন তাহার অন্তর রোগ শোক হইতে মুক্তি লাভ করে আর বিশুদ্ধ অনুভূতি সম্পন্ন হইয়া উঠে। সুতরাং বিশুদ্ধ অনুভূতি ও নির্মল আস্বাদন ক্ষমতার কারণে তাহার ঈমানে মজা ও স্বাদ লাভ হইতে থাকে। আর যদি সে আল্লাহ থেকে অমনোযোগী হওয়ার রোগে আক্রান্ত হয় তাহা হইলে সে ঈমানের মজা ও স্বাদ পাইবে না। ইহার উদাহরণ এইরূপ যে, জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে অধিকাংশ সময় চিনি তিক্ত লাগে। অথচ বাস্তবে চিনি তিক্ত নয়। শুধু তাহার জ্বরের কারণেই তাহার কাছে তিক্ত লাগে। রুগ্ন ঈমান বিশিষ্ট লোকও তদ্রূপ। সুতরাং যখন তাঁহার ঈমানের রোগ দূরীভূত হইয়া যায়। তখন সে সমস্ত

জিনিসের হাকিকত বুঝিতে পারে। আর ঈমান ও ইবাদতের স্বাদ ও মজা এবং আল্লাহর সম্পর্ক ছিন্ন করার ও তাঁহার বিরোধিতা করার তিক্ততা পাইতে থাকে। যখন সে ঈমানের মজা পায় তখন সে খুশী হইয়া যায়। আর আল্লাহ পাকের ইহসান প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। অতঃপর এমন সব জিনিস অনুসন্ধান করে যাহা দ্বারা ঈমান মজবুত হয় এবং অর্জিত হয়। যখন ইবাদতের মজা পায় তখন ইহা সর্বদা করিতে থাকে এবং ইহাতে আল্লাহ পাকের ইহসান দেখিতে থাকে। আর যখন আল্লাহ পাকের নাফরমানীর তিক্ততা অনুভব করে তখন আল্লাহর নাফরমানী বর্জন করে। ইহার দিকে ঝুঁকে না। বরং ইহা ঘৃণা করে। তাহার এই অবস্থা গোনাহ পরিত্যাগ করার এবং গোনাহের দিকে না ঝুঁকিবার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হয়। গোনাহ পরিত্যাগ করা এবং গোনাহের দিকে না ঝুঁকা পৃথক পৃথক দুইটি বিষয়। গোনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হইল এই যে, ঈমানদার স্বীয় অর্ন্তদৃষ্টির নূরের মাধ্যমে জানিতে পারে যে আল্লাহ পাকের বিরোধিতা করা এবং তাঁহার প্রতি অমনোযোগী হওয়া অন্তরের জন্য বিষস্বরূপ।

বিষমিশ্রিত খাদ্যের প্রতি তোমাদের যেরূপ ঘৃনা হয় মুমিনদের অন্তরে আল্লাহর নাফরমানীর প্রতি এমন ঘৃণার সৃষ্টি হয়

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, و بالاسلام دينا ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে। কেননা, ইসলামকে স্বীয় দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করার অর্থ স্বীয় প্রভুর প্রিয় ও পছন্দনীয় জিনিসের উপর সন্তুষ্ট হওয়া। ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন-

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ *

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে সত্য দ্বীন হইল ইসলাম।"

অন্য একস্থানে বলিয়াছেন-

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ *

"যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুকে দ্বীন হিসাবে অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে তাহা কখনও কবুল করা হইবে না।"

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ *

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য দ্বীন মনোনীত করিয়াছেন। মুসলমান হওয়া ব্যতীত তোমরা মৃত্যুবরণ করিও না।"

যখন কোন ব্যক্তি ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করিয়া রাজী থাকিবে তখন ইহার নির্দেশগুলি পালন করা এবং ইহার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হইতে বিরত থাকা তাহার জন্য অপরিহার্য হইয়া পড়িবে। অধিকন্তু তাহার জন্য জরুরী হইল অন্যান্যদিগকে ভাল কথা শিক্ষা দেওয়া, খারাপ কর্ম ও কথা হইতে বিরত রাখা, আর যখন কোন পথভ্রষ্টকে দেখিতে পাইবে যে, দ্বীন নহে এমন জিনিসকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করিতে চায় তখন ইহা বন্ধ করিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ জন্মিবে। দলীল প্রমানের দ্বারা তাহার মস্তিষ্ক ধৌত করিবে; বয়ান বক্তৃতার দ্বারা তাহার এই পথভ্রষ্টতার মূলোৎপাটন করিবে।

উল্লিখিত হাদীছে بمحمد نبيا "মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হওয়ার উপর সন্তুষ্ট থাকে।" বলা হইয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছে তখন তাহার জন্য অপরিহার্য হইল যে, সে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত করনেওয়ালা হইবে, তাঁহার স্বভাব চরিত্র ও নিয়ম পদ্ধতি গ্রহণ করিবে। পার্থিবতার অনাসক্তি, দুনিয়া হইতে পৃথক থাকা, অন্যের অপরাধ ক্ষমা করা, তাহার প্রতি খারাপ আচরণকারীকে মাফ করিয়া দেওয়া হইবে এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে তাঁহার অনুকরণ করিবে। অনুরূপভাবে কথাবার্তায়, চলাফেরায়, গ্রহণ-বর্জনে, প্রীতি-ঘৃণায়, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রে তাঁহার অনুকরণকারী হইবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে সে তাঁহার সামনে স্বীয় গর্দান নত করিবে। ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করিলে ইসলামের বিধান মোতাবেক আমল করিবে। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে গ্রহণ করিলে তাহার অনুকরণ করিবে।

উল্লিখিত বিষয়ত্রয়ের মধ্যে যদি কোন একটি না পাওয়া যায় আর অবশিষ্ট দুইটি পাওয়া যায় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, একটিও পাওয়া যায় নাই। কেননা ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করিতে রাজী না হইয়া আল্লাহকে প্রতিপালক মানিয়া লওয়ার দাবী অসম্ভব। আবার মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী মানিয়া লইতে রাজী না হইয়া ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মানিয়া লওয়ার দাবীও অসম্ভব। ইহাদের প্রত্যেকটি একে অপরের জন্য অপরিহার্য।

ইহার পর জ্ঞাতব্য বিষয় হইল একীনের পর্যায়ের আলোচনা। একীনের পর্যায় নয়টি। তাওবা, পার্থিবতা ত্যাগ, ধৈর্যধারণ, শুকরিয়া, ভয়, সন্তুষ্ট থাকা, আশা করা, তাওয়াক্কুল, মহব্বত। উল্লেখিত পর্যায়গুলির মধ্যে কোন একটি

পর্যায়ও ব্যবস্থা গ্রহণ ও বর্জন করা স্বীয় এখতিয়ার বর্জন করা ব্যতীত সহীহ হইতে পারে না।

যেমন, তাওবা। তাওবাকারী স্বীয় গোনাহ হইতে তাওবা করা অপরিহার্য। অনুরূপভাবে স্বীয় পরোয়ারদিগারের ব্যবস্থা গ্রহণের সামনে স্বীয় ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে তাওবা করাও অপরিহার্য। কেননা আল্লাহর ব্যবস্থা গ্রহণের সামনে নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্বীয় এখতিয়ার থাকা অন্তরের বড় বড় গোনাহের অন্তর্ভুক্ত।

তাওবার অর্থ আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় বিষয় হইতে ফিরিয়া আসা। আল্লাহ পাকের নির্ধারনের সামনে ব্যবস্থা গ্রহণ আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ইহা আল্লাহ পাকের প্রতিপালন নামক গুণের মধ্যে শিরক করা। বিবেক নামক নিয়ামতের না শুকরিয়া করা। বান্দাদের না শুকরিয়া আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না।

সুতরাং পার্থিব ব্যবস্থা গ্রহণে লিপ্ত ও স্বীয় মনিবের মঙ্গলময় বিবেচনা হইতে অমনোযোগী ব্যক্তির তাওবা কিভাবে সহীহ হইতে পারে?

অনুরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের নির্ধারনের পরও ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে পৃথক না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পার্থিবতা ত্যাগ করাও বিশুদ্ধ হইবে না। কেননা যে সব জিনিসকে মুক্ত হওয়ার এবং অনাসক্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণও একটি। সুতরাং ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে পৃথক থাকা জরুরী।

পার্থিবতা ত্যাগ দুইভাবে হয়। এক বাহ্যিক ত্যাগ অপর গোপনীয় ত্যাগ। বাহ্যিকভাবে পার্থিবতা ত্যাগ বলিতে পানাহার, পরিধান ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োজনতিরিক্ত জিনিসের প্রতি অনাসক্তি থাকাকে বুঝায়। আর গোপনীয় পার্থিবতা ত্যাগ বলিতে প্রাধান্যতা, নেতৃত্ব, খ্যাতি প্রভৃতির প্রতি আকাঙ্খা না থাকাকে বুঝায়। আল্লাহর নির্ধারণের পরও ব্যবস্থা গ্রহণ ইহারই অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ ত্যাগ না করা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ এবং শুকরিয়া আদায়ও বিশুদ্ধ হয় না

আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ধৈর্যধারন করে (অর্থাৎ সেগুলি হইতে বিরত থাকে) প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই ধৈর্যধারণকারী। আল্লাহ পাকের সামনে স্বীয় এখতিয়ার থাকা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করাও তাঁহার অপছন্দনীয়। কেননা ধৈর্যধারন কয়েকভাবে হইয়া থাকে। যেমন ১। হারাম জিনিসসমূহ থেকে ধৈর্যধারন করা। ২। অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহ পালন করার মাধ্যমে ধৈর্যধারণ করা। ৩। আল্লাহ পাকের সামনে স্বীয় এখতিয়ার বজায় রাখা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে ধৈর্যধারন করা। অর্থাৎ এখতিয়ার না রাখা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। অথবা ধৈর্যধারণের প্রকার ভেদ এইভাবেও বর্ণনা করা যায় যে, ধৈর্যধারণ মোটামুটি দুই প্রকার। এক মানবীয় চাহিদা পরিহার করার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা। দুই, বন্দেগীর অপরিহার্য বিষয়সমূহ পালনের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সামনে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ বর্জন করা ও বন্দেগীর অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সামনে ব্যবস্থা গ্রহণ বর্জন না করে তাহার শুকরিয়াও বিশুদ্ধ হইবে না। হযরত জুনায়েদ (রহঃ)-এর অভিমত মোতাবেক শুকরিয়া হইল আল্লাহ পাকের নিয়ামতসমূহকে তাঁহার নাফরমানীর মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ না করা।

জড় পদার্থসমূহ ও পশু পক্ষীসমূহ ব্যবস্থা অবলম্বন করে না। আর ইহারা বিবেকহীন। বিবেক খুব মূল্যবান জিনিস। ইহার দ্বারা মানুষ অন্যান্য সমস্ত কিছু থেকে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহা তাহাদের পূর্ণতার উপায়। ইহার মাধ্যমে শেষ পরিণাম চিন্তা করা যায়। এত মূল্যবান সম্পদ থাকার পরও মানুষ আল্লাহ পাকের সামনে ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এত মূল্যবান সম্পদকে তাহার নাফরমানী অর্থাৎ ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে। ব্যবস্থা অবলম্বন করা আল্লাহ পাকের ভয় পোষণ করার পরিপন্থী। কেননা যখন অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় থাকে তখন তাহাকে এতটুকু সুযোগ দেয় না যে, সে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে।

আল্লাহর প্রতি যাহার প্রবল আশা রহিয়াছে তাহার অবস্থাও তদ্রূপ। কারণ তাহার আশা সর্বদা তাহাকে খুশীতে ভরপুর করিয়া রাখে। তাহার সময়গুলি আল্লাহ পাকের ব্যাপারে নিয়োজিত থাকে। সুতরাং তাহার কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ কোথায়?

ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলেরও পরিপন্থী। কেননা যে ব্যক্তি স্বীয় সর্বপ্রকার ক্ষমতা আল্লাহ পাকের কাছে সোপর্দ করে এবং স্বীয় সর্বকার্যে তাঁহার প্রতি নির্ভর করে সে ব্যক্তি তাওয়াক্কুলকারী। সুতরাং ইহার জন্য অপরিহার্য হইল ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করা আর তাঁহার হুকুম পালনে নতশীল হইয়া যাওয়া।

আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করা এবং তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার সাথে ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করার সম্পর্ক অন্যান্য বিষয়ের সাথে ইহার সম্পর্ক অপেক্ষা অনেক পরিস্কার ও উজ্জ্বল।

ব্যবস্থা অবলম্বন করা আল্লাহর মহব্বতেরও পরিপন্থী। কেননা প্রেমিক স্বীয় প্রেমাস্পদের প্রেমে নিমজ্জিত থাকে। প্রেমিকের এই অবস্থার চাহিদা হইল এই যে, প্রেমিক স্বীয় প্রেমাস্পদের সামনে স্বীয় সর্বপ্রকার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবে। সুতরাং প্রেমিকের ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন সুযোগই থাকিবে না। কেননা আল্লাহর প্রেম তাহাকে এই দিক থেকে সম্পূর্ণ অমনোযোগী করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্যই কোন এক বুযুর্গ ব্যক্তি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিশেষ মহব্বতের সামান্য মজাও পাইয়াছে সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছু হইতে অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছে।

অনুরূপভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকারও পরিপন্থী। ব্যবস্থা অবলম্বন এই ক্ষেত্রে পরিপন্থী হওয়া অধিকতর পরিস্কার ও উজ্জ্বল বিষয়। ইহাতে কোনরূপ সংশয়ের অবকাশ নাই। এইজন্য যে, যখন কোন ব্যক্তির আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকার যোগ্যতা অর্জিত হইয়াছে। সে আল্লাহ পাকের ভবিষ্যত ব্যবস্থা গ্রহনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। সুতরাং সে নিজে কেন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে? কেননা সে তো আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা গ্রহণের উপর সন্তুষ্টই হইয়াছে। তোমাদের কি এই খবর নাই যে, আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার নূর অন্তর থেকে ব্যবস্থা অবলম্বনের ময়লা আবর্জনা ধৌত করিয়া দেয়? সুতরাং সন্তুষ্ট ব্যক্তি সন্তুষ্টির নূরের প্রভাবে স্বীয় প্রভুর আহকাম পালনে খুশী। সে প্রভুর সামনে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করে না। গোলামের জন্য তাহার মনিবের সুন্দর ব্যবস্থা গ্রহণই উত্তম।

ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করার কারণ সমূহের বিবরণ

ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার ও এখতিয়ার পরিহার করার কয়েকটি কারণ রহিয়াছে।

প্রথম কারণ ঃ তোমার এই বিশ্বাস যে, প্রথম থেকেই আল্লাহ পাক তোমার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছেন। তুমি যখন তোমার ছিলে না তখনও আল্লাহ পাক তোমার ছিলেন। যখন তোমার অস্তিত্ব ছিল না তখন তো তোমার জন্য তোমার নিজের কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা ছিল না তখনও আল্লাহ পাক তোমার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তোমার সব বিষয়ের ব্যবস্থাপক ছিলেন। অনুরূপভাবে তোমার অস্তিত্বের পরও তিনি তোমার সব কিছুর ব্যবস্থাপক। তুমি আল্লাহর সাথে এমন হইয়া থাক যেমন তুমি পূর্বে ছিলে। তাহা হইলে তিনিও তোমার জন্য এমন থাকিবেন যেমন পূর্বে ছিলেন। এই জন্যই হুসায়ন হাল্লাজ দোয়া করিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য

এমন হইয়া যান যেমনি আপনি আমার অস্তিত্বের পূর্বে আমার জন্য ছিলেন। তাহার দোয়ার সারকথা হইল হে আল্লাহ! আমার অস্তিত্বের পূর্বে আপনি আমার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার অস্তিত্বের পরেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

যখন বান্দার অস্তিত্ব ছিল না যে সে নিজের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী করিতে পারে এই ক্ষেত্রে তাহার সাহায্য হইতে পারে তখনও আল্লাহর পাকের ইলমে বান্দার জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং বান্দার অস্তিত্বের পূর্বেই আল্লাহ পাক তাহার জন্য সমুদয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছেন। যদি কেহ এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, বান্দার অস্তিত্বের পূর্বে তো অনস্তিত্ব ছিল। কোন কিছু ছিল না। সুতরাং কিসের জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে? ইহার উত্তর হইল যে, অস্তিত্ব আসার পূর্বে সবকিছুই আল্লাহ পাকের ইলমে মওজুদ ছিল। যদিও তখন পর্যন্ত বাস্তবক্ষেত্রে ইহারা মওজুদ ছিল না। সুতরাং যখন ইহারা আল্লাহ পাকের ইলমের জগতে মওজুদ ছিল তখন তিনি ইহাদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা খুব চিন্তা করিয়া দেখার বিষয়। এখানে ইহার বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নাই।

বিবরণ ঃ আল্লাহ পাক সর্বদিক দিয়া তোমার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের জিম্মাদার। সর্বাবস্থায় তোমার অস্তিত্ব দানের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়াছেন। অঙ্গীকার গ্রহণের দিনও তোমার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। সে দিনে সকল মানুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? তখন সকলেই একবাক্যে জবাব দিয়াছিল, কেন নহেন? অর্থাৎ নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রতিপালক। তখন তোমার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন যে, তিনি তোমার কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। তখন তুমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলে। তোমাকে স্বীয় নূর দেখাইয়াছিলেন। তুমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলে। তোমাকে কথা বলিতে শিখাইয়াছিলেন। তোমার অন্তরে তাঁহার প্রতিপালনের স্বীকৃতির কথা প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন। তখন তুমি তাঁহার অদ্বিতীয়তার স্বীকৃতি দিয়াছিলে। অতঃপর তোমাকে বীর্যের আকারে বাপ দাদার মেরুদন্ডে রাখিয়াছিলেন। সেখানেও তোমার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। তোমার হেফাজত করিয়াছেন। যেখানে ছিলে তোমার হেফাজত করিয়াছেন। যে কোন ব্যক্তির মধ্যেই ছিলে সেখান থেকে একের পীঠ হইতে অপরের পীঠে পৌঁছাইয়াছেন। হযরত আদম (আঃ) থেকে এই ধারাবাহিকতা শুরু হইয়া তোমার পিতা পর্যন্ত তোমাকে পৌঁছাইয়াছেন। অতঃপর তোমার পিতা হইতে তোমার মাতার জরায়ুতে পৌঁছাইয়াছেন। সেখানে তোমার অস্তিত্বের জন্য

পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন। জরায়ুতে এক প্রকার যোগ্যতা রাখিয়া ইহাকে একটি উর্বরা জমির ন্যায় করিয়াছেন যাহাতে তুমি সেখানে হৃষ্টপুষ্ট হইতে পার। ইহাকে আমনত রাখা এমন স্থানে পরিণত করিয়াছেন যাহাতে এইস্থানে রাখিয়া তোমাকে জীবন দান করা যায়। অতঃপর এইস্থানে মাতাপিতা উভয়ের বীর্যের মিলন ঘটাইয়াছেন। ফলে তুমি জন্মলাভ করিয়াছ। ইহাতে আল্লাহর বিশেষ হিকমত রহিয়াছে যে, গোটা সৃষ্টি জাতির অস্তিত্ব বৈবাহিক সম্পর্কের মাঝে গচ্ছিত। অতঃপর এই বীর্য থেকে তোমাকে জমাটবাধা রক্তে পরিনত করা হইয়াছে। আর এই জমাটবাধা রক্তে এমন গুন ও বৈশিষ্ট্য রাখা হইয়াছে যাহা দ্বারা তোমার জন্মের পরবর্তী পর্যায়গুলি সুষ্ঠ ও সুন্দর হইয়া উঠে। অতঃপর জমাট বাধা রক্ত গোশতের টুকরায় পরিনত করা হইয়াছে। আর এই টুকরায় তোমার আকৃতি সৃষ্টি করা হইয়াছে। তোমার ভিত্তি রচনা করা হইয়াছে। অতঃপর তোমার মধ্যে ফুঁক দিয়া রূহ প্রবিষ্ট করানো হইয়াছে। আর মাতৃগর্ভে তাহার হায়েযের রক্ত দ্বারা তোমাকে খাদ্য দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে তুমি ভুমিষ্ট হওয়ার পূর্বেই তোমার খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার পর তোমাকে মাতৃগর্ভে ছাড়িয়া রাখা হইয়াছে। সেখানে থাকিয়া তোমার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সুদৃঢ় ও শক্ত হইয়াছে। হাত পা মজবুত হইয়া উঠিয়াছে যাহাতে তুমি এমন স্থানে আসার যোগ্যতা অর্জন কর যেখানে তোমার লাভ-লোকসান রহিয়াছে। যাহাতে তোমাকে এমন ঘরের দিকে লইয়া আসিতে পারেন যেখানে তিনি স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মাধ্যমে তোমাকে নিজের সাথে পরিচয় করাইতে পারেন। অতঃপর তিনি তোমাকে ভূপৃষ্ঠে আনয়ন করিয়াছেন। তখন তিনি অবগত ছিলেন যে, তুমি কোন শক্ত খাবার খাইতে সক্ষম নহে এবং তোমার দাঁত নাই। অধিকন্তু তোমার এমন কোন মাড়ি নাই যাহা দ্বারা তুমি খাদ্য খাইতে পার। তাই মাতার বুকে নরম ও মজাদার খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন। মাতার অন্তরে এমন মমতা ভরপুর করিয়া দিলেন যাহা দ্বারা তোমাকে দুধপান করানোর জন্য মাতা ব্যাকুল হইয়া উঠেন। যখন দুধ বাহির হওয়া থামিয়া যায় তখন মাতৃমমতা মাতাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। আর মাতার মধ্যে এমন ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয় যাহাতে কখনও ভাটা আসে না। আর মাতা তোমার জন্য এমনভাবে প্রস্তুত হইয়া পড়েন যাহা কখনও থামিয়া যায় না। অতঃপর মাতাপিতাকে এমন সব কার্যে লাগাইয়া দেন যাহা দ্বারা তোমার জন্য উপকারী জিনিসসমূহ লাভ হয় এবং তাহারা তোমার প্রতি মেহেরবান হন। তোমাকে স্নেহ ও দয়ার দৃষ্টিতে দেখেন। প্রকৃতপক্ষে এই স্নেহ ও মমতা এমন এক সত্ত্বার স্নেহ ও মমতা যিনি ইহা তোমার প্রতি ও অন্যান্যদের প্রতি প্রেরণ করার জন্য

পিতামাতাকে প্রকাশস্থল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহাতে এই সত্ত্বা তোমার কাছে মহব্বতকারী হিসাবে পরিচিত হন। আর তুমি জানিয়া লইতে পার যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রতিপালন ব্যতীত তোমার অন্য কোন প্রতিভু নাই। তাঁহার খোদায়ীত্ব ব্যতীত তোমার অন্য কোন প্রতিপালনকারী নাই। অতঃপর তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তোমার দেখাশুনা করা পিতামাতার অপরিহার্য কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় দয়ার মাধ্যমে ইহা তাহাদের উপর ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন। আর তোমার পুরাপুরি বুঝ শক্তি আসা পর্যন্ত তোমার কার্যক্রমের অপরাধ মার্জন করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর যৌবনে পদার্পন পর্যন্ত তোমার প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ, করুনা ও ইহসান সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। এইভাবে তোমার বার্ধক্য পর্যন্ত বরং জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত স্বীয় অনুগ্রহ ও করুনার মধ্যে নিমজ্জিত রাখিয়াছেন। যখন তুমি মৃত্যু বরণ করিবে ও পরে জীবিত হইয়া কিয়ামতের ময়দানে উঠিবে আর তোমাকে আল্লাহ পাকের সম্মুখে খাড়া করা হইবে এবং স্বীয় আযাব ও শাস্তি হইতে তোমাকে বাঁচাইয়া দিবেন। অতঃপর তোমাকে বেহেশতে প্রবিষ্ট করিবেন। তোমার সম্মুখ হইতে স্বীয় পর্দা উঠাইয়া দিবেন এবং স্বীয় বন্ধু ও আশেকদের মজলিসে তোমাকে বসাইবেন। যেমন কুরআনে পাকে আল্লাহ পাক নিজেই বলিয়াছেন-

"পরহেজগার লোকেরা সর্বশক্তিমান বাদশাহের কাছে সত্য মজলিসে বেহেশত ও ঝর্ণাসমূহে থাকিবে।" অর্থাৎ সর্বস্থানে তোমার প্রতি আল্লাহ পাকের কোন ইহসানের শুকরিয়া আদায় করিতে পারিবে আর কোন নিয়ামতের বর্ণনা সক্ষম হইবে? দেখ আল্লাহ পাক বলিতেছেন-

و ما بكم من نعمة فمن الله *

"তোমাদের কাছে যে সকল নিয়ামত রহিয়াছে এই সব কিছু আল্লাহরই নিয়ামত।"

সুতরাং বুঝা গেল যে, তুমি কখনও তাঁহার ইহসানের বাহিরে যাইতে পার নাই। আর কখনও পারিবেও না। তাঁহার অনুগ্রহ ও করুণা কখনও তোমার থেকে পৃথক হইতে পারে না। যদি তোমার উল্লিখিত পরিবর্তন ও বিবর্তনের কথা আল্লাহ পাকের কুরআন হইতে জানিতে চাও তাহা হইলে আল্লাহ পাকের ইরশাদ শুন-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَكِيْنٍ * ثُمَّ

خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ *

নিশ্চয়ই আমি আদমকে মাটির সার পদার্থ থেকে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর আমি তাহাকে অবস্থানস্থলে বীর্য হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর বীর্য হইতে জমাট বাধা রক্তে পরিনত করিয়াছি। অতঃপর জমাটবাধা রক্তকে গোশতের টুকরায় পরিণত করিয়াছি। অতঃপর গোশতের টুকরাকে হাড় বানাইয়াছি। আর হাড়ে গোশত জড়াইয়াছি। অতঃপর আমি ইহাকে দ্বিতীয় জন্ম দিয়াছি। (অর্থাৎ ইহাতে রূহ প্রবিষ্ট করাইয়াছি।) অতএব আল্লাহ পাক খুব বরকতময়। সর্বপ্রকার প্রস্তুতকারী অপেক্ষা আল্লাহ পাক উত্তম। অতঃপর তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। অতঃপর কিয়ামতের দিনে পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করা হইবে।

ফায়দা ঃ আয়াত সমূহের জ্যোতি তোমার প্রতি বিচ্ছুরিত হইবে। ইহার কিরণের প্রভাব তোমার প্রতি পড়িবে। ইহাতে বর্ণিত বিষয় তোমার শির নত করিবে। তোমাকে তাওয়াক্কুল শিক্ষা দিবে। ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করিবার এবং তকদীরের মোকাবিলা না করিবার দিকে তোমাকে পথ প্রদর্শন করিবে। তৌফিক দেওয়া তো আল্লাহর কাজ।

দ্বিতীয় কারণ ঃ নিজের জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রমাণ করে যে, সে নিজের লাভের বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ। কেননা মুমিনের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর সামনে নিজের জন্য স্বীয় ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করে তখন আল্লাহ পাক তাহার জন্য আরও উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আল্লাহ পাক নিজেই বলেন

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ *

"যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ভরসা করে আল্লাহ তাহার জন্য যথেষ্ঠ।"

সুতরাং তোমার ব্যবস্থা অবলম্বন এই যে, তুমি যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন হইতে বিরত থাক। আর তোমার নিজের মঙ্গল কামনা এই যে, তুমি ইহার ফিকিরই না কর।

এখানে আল্লাহ পাকের নিম্নোল্লেখিত বাণীটি বুঝিয়া লও, আল্লাহ পাক বলেন-

তোমরা ঘরে আস, ইহাদের দরজা দিয়া। সুতরাং ব্যবস্থা অবলম্বনের দরজা

আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে ইহাই যে, নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিও না।

তৃতীয় কারণ ঃ তাকদীর গৃহীত ব্যবস্থা মোতাবেক জারী হওয়া জরুরী নহে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন কার্যও সম্পন্ন হইয়া থাকে যাহার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। আর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে এমন কার্যও অনেক ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয় না। বুদ্ধিমান লোক ঠিকানাবিহীন ঘর বানায় না। সুতরাং তোমার সৌধ পুরা হওয়ার পূর্বেই তাকদীর ইহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেছে এবং ইহা পুরা হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতেছে। কবির ভাষায়-

☆ ইমারত কখন পুরা হয় যাহা তুমি নির্মাণ করিতেছ।

☆ কিন্তু এখানে হইতেছে অন্য কাজ সে ইহার পতন ঘটাইতেছে।

যখন তুমি কোন বিষয়ের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন কর আর তাকদীর ও তোমার গৃহীত ব্যবস্থার পরিপন্থী জারী হয়। সুতরাং তাকদীর যে ব্যবস্থার সহায়তা না করে এমন ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা কি লাভ? ব্যবস্থা তো এমন সত্ত্বা গ্রহণ করিতে পারে তাকদীরের রজ্জু যাহার হাতে রহিয়াছে। কবির ভাষায়-

☆ যখন আমি তাকদীরকে প্রভাবশীল পাইয়াছি।

☆ আর ইহা প্রভাবশীল হওয়াতে কোন রূপ সন্দেহের অবকাশ নাই।

☆ তখন মহান সৃষ্টিকর্তার উপর করিয়াছি নির্ভর।

☆ যে দিকে তাহা জারী হয় সে দিকে নিজে চলিয়াছি।

চতুর্থ কারণ ঃ আল্লাহ পাক নিজেই স্বীয় রাজত্বের ব্যবস্থা গ্রহণের জিম্মাদার। উন্নতির দিক হোক বা অবনতির দিক হোক; দৃশ্যমান বিষয়ের হোক বা অদৃশ্য বিষয়ের হোক সবকিছুর তিনিই জিম্মাদার। আরশ, কুরসী, আসমান, যমীন সবকিছুর ব্যবস্থা তিনিই করেন। যেহেতু তুমি স্বীকার করিতেছ যে, তিনিই এইসব কিছুর ব্যবস্থাপক তবে তোমার অস্তিত্বের তিনিই ব্যবস্থাপক ইহাও স্বীকার করিয়া লও; কেননা এই মহাবিশ্বের তুলনায় তোমার অস্তিত্ব এতছোট যে, তুমি হিসাবেরও তুল্য নহে। যেমন সাত আসমান ও সাত যমীন কুরসীর তুলনায় এত ক্ষুদ্র যে কোন এক বিশাল প্রান্তরে যেন ক্ষুদ্র একটি চুড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। অনুরূপভাবে কুরসী, সাত আসমান ও সাত যমীনের সমষ্টি আরশের তুলনায়ও তদ্রূপ ক্ষুদ্র। সুতরাং আল্লাহর এই মহা বিশ্বে তোমার কি হিসাব হইতে পারে? যেহেতু আল্লাহ পাক এই মহাবিশ্বের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপক। আর তুমি এত ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও তোমার সম্পর্কে তাঁহার ব্যবস্থা গ্রহণের উপর নির্ভর না করিয়া যদি তুমি নিজের চিন্তায় লাগিয়া যাও এবং নিজের জন্য ব্যবস্থা

অবলম্বন করিতে থাক, তাহা হইলে ইহা হইবে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ সম্পর্কে তোমার অজ্ঞতার প্রমাণ। বরং প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার ইহাই যাহা আল্লাহ পাক নিজেই বলিয়াছেন-

وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ *

"আল্লাহ পাককে যেভাবে কদর করা তাহাদের দায়িত্ব ছিল তাহারা তাহাকে সেভাবে কদর করে নাই।"

যদি বান্দা স্বীয় প্রভুর পরিচয় লাভ করে তাহা হইলে তাহার সামনে যে কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে লজ্জা বোধ করে। যেহেতু তুমি খোদা তাআলার পরিচয় লাভ কর নাই বরং তাহার পরিচয়ও তোমার মধ্যে পর্দা পড়িয়া রহিয়াছে আর ইহাই তোমাকে ব্যবস্থা অবলম্বনের সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছে।

একীনওয়ালা ব্যক্তিদের অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে এই পর্দা উঠিয়া যায়। ফলে তাহারা নিজেদের সম্পর্কে দেখিতে পায় যে, তাহাদের ব্যবস্থা অন্য কেহ করিতেছে। তাহারা নিজেরা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেছে না। বরং তাহাদেরকে অন্য কেহ পরিচালনা করিতেছে। তাহারা নিজেরা নিজেদের পরিচালনা করিতে পারিতেছে না। তাহাদিগকে অন্য কেহ গতিশীল করিতেছে। তাহারা নিজেরা নিজকে গতিশীল করিতে পারিতেছে না। অনুরূপভাবে আসমানে বসবাসকারীগণ আল্লাহ পাকের কুদরতের প্রকাশ, তাঁহার ইচ্ছার প্রতিফলন, যাহার কাছে তাঁহার কুদরত সম্পর্কিত হইবে ইহার সাথে কুদরত সম্পর্কিত হওয়া, যাহার সাথে তাঁহার ইচ্ছা সম্পর্কিত হইবে উহার সাথে ইচ্ছার সম্পর্কিত হওয়া প্রভৃতি সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আল্লাহর জন্য কোন মাধ্যমের কোন প্রয়োজন নাই। সবকিছু তাঁহারই হাতে। আসমান-যমীন উভয়স্থানে পরিপূর্ণ ব্যবস্থাগ্রহণ তাঁহারই হস্তে ন্যাস্ত।

সুতরাং আসমান যমীনের ক্ষেত্রে যখন তুমি আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা গ্রহণকে স্বীকার করিয়া লইয়াছ। অনুরূপভাবে তোমার অস্তিত্বের ক্ষেত্রেও ইহা স্বীকার করিয়া লও।

কেননা তুমি তো আসমান যমীন অপেক্ষা নিঃসন্দেহে ক্ষুদ্র সৃষ্টি। অতএব বৃহৎ সৃষ্টির পর ক্ষুদ্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে তো অবশ্যই মানিয়া লওয়া উচিত।

পঞ্চম বিষয় ঃ তুমি আল্লাহর মালিকানাধীন। সুতরাং যে জিনিস অন্যের মালিকানাধীন সে জিনিস সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার অধিকার তোমার

নাই। তুমি যে জিনিসের মালিক সে জিনিস সম্পর্কে তোমার সাথে কোন ব্যক্তি ঝগড়া করার হক রাখে না। অথচ তোমার মালিকানা প্রকৃত মালিকানা নহে। তোমাকে মালিক বানানো হইয়াছে বলিয়া তুমি মালিক। শুধু একটি শরয়ী সম্পর্ক যাহার কারণে তুমি ইহার মালিক, তুমি যে জিনিসের মালিক হইয়াছ তাহা এমন নহে যে তোমার দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং আল্লাহর মালিকানাধীন কোন জিনিস সম্পর্কে তাঁহার সাথে ঝগড়া বাধাইয়া দেওয়া তো আরও অধিক অনুচিত হইবে। বিশেষ করিয়া আল্লাহ পাক যখন ঘোষণা করিয়াছেন-

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ *

"নিশ্চয়ই আল্লাহ বেহেশতের বিনিময়ে মুমিনদের থেকে তাহাদের জান ও মাল খরিদ করিয়া লইয়াছে।"

সুতরাং জান ও মাল বিক্রিত হইয়া যাওয়ার পর এই সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা ও বিতর্ক করা উচিত নহে। কেননা যে জিনিস তুমি বিক্রি করিয়া দিয়াছ; উহা ক্রেতার হাতে সোপর্দ করা আর এই সম্পর্কে কোন ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্ক সৃষ্টি না করা তোমার অপরিহার্য কর্তব্য। ইহার পরেও ইহা সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা ও স্বীয় ক্ষমতা খাটানোর চেষ্টা করা বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ করার শামিল।

একদা আমি আবুল আব্বাস মুরসী (রঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া কোন একটি ঘটনা সম্পর্কে বিচার দায়ের করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, যদি তোমার নফসের মালিক তুমি হও, তাহা হইলে ইহার সাথে তোমার যাহা মনে চায় তাহাই কর। অবশ্য তুমি তাহা পারিবে না। আর যদি মনে কর যে, সৃষ্টিকর্তা ইহার মালিক। তাহা হইলে ইহা মানিয়া লও যে তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাহাই করিবেন। অতঃপর তিনি আরও বলিলেন, তবে বিষয়টি আল্লাহর সোপর্দ করা আর এই সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা পরিহার করার মধ্যেই প্রকৃত শান্তি রহিয়াছে। আর বন্দেগীর অর্থও ইহাই।

ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) থেকে এক ঘটনা বিবৃত আছে। তিনি বলেন, এক রাত্রে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। ফলে আমার দৈনন্দিন আমল কাযা হইয়া পড়িয়াছিল। আমি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া খুব লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। অতঃপর তিনদিন এইভাবে ঘুমাইয়া পড়িলাম যে, আমার ফরয পর্যন্ত কাযা হইয়া পড়িল। আমি জাগ্রত হওয়ার পর অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম।

সর্বপ্রকার গোনাহ আমি ক্ষমা করি কিন্তু আমার থেকে মুখ ফিরাইয়া লওয়া অধিকতর মারাত্মক অপরাধ।

তোমার ইবাদত অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইহাতো মাফ করিয়া দিয়াছি।

তবে ইহার বিনিময় সঞ্চিত রহিয়াছে।

অতঃপর আমাকে নির্দেশ দেয়া হল যে, হে ইবরাহীম তুমি বান্দা (দাস) হইয়া থাক। তখন আমি বান্দা হইয়া রহিলাম। ফলে আমার অন্তর শান্ত হইয়া গেল

ষষ্ঠ বিষয় ঃ তুমি আল্লাহর মেহমান। কেননা এই দুনিয়া আল্লাহর ঘর। তুমি এখানে আসিয়া মেহমান হইয়াছ। মেজবান (নিয়ন্ত্রনকারী) যতক্ষণ পর্যন্ত উপস্থিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মেহমানের কোন প্রকার চিন্তায় নিমজ্জিত না হওয়া উচিত। কেননা তাহার ব্যাপারে মেজবান তৎপর রহিয়াছে এবং তাহার খানাপিনা ও আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করায় সে সম্পূর্ণ তৎপর।

শায়খ আবু মাদইয়ান (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, হযরত! আমরা অন্যান্য মাশায়েখদেরকে দেখিতেছি যে, তাহারা জীবিকা নির্বাহের কোন না কোন উপায় অবলম্বন করিয়া আছেন। আর আপনি ইহা অবলম্বন হইতে বিরত থাকিতেছেন, ইহার কারণ কি? তিনি জবাব দিলেন, হে ভ্রাতা! ইনসাফের সাথে কথা বল! দুনিয়া আল্লাহর ঘর! আর আমরা তাঁহার মেহমান। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মেহমানদারী তিনদিন পর্যন্ত হয়। সুতরাং আমরাও তিনদিনের জন্য আল্লাহ পাকের মেহমান। অধিকন্তু আল্লাহ পাক বলেন, যে তোমার প্রতিপালকের কাছে এক দিবস তোমাদের গণতি হিসাবে এক হাযার বৎসরের সমান। এই হিসাবে তিন দিবসের পরিমাণ মোট তিন হাজার বৎসরের সমান হয়। সুতরাং আমরা তিনহাযার বৎসরের জন্য আল্লাহ পাকের মেহমান সাব্যস্ত হইয়াছি। ইহার একাংশ আমরা দুনিয়াতে অবস্থান করিব আর অবশিষ্ট সময় তিনি স্বীয় অনুগ্রহে পরকালে পুরা করিবেন। আর বেহেশতে চিরদিন রাখার ফয়সালা তাঁহার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত অনুগ্রহ।

সপ্তম বিষয়ঃ- বান্দা সর্ব জিনিসে আল্লাহ পাকের কায়েম রাখার গুণকে দেখিবে। তুমি কি তাঁহার বাণী শুন নাই

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ *

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব। কায়েম রাখনেওয়ালা। সুতরাং আল্লাহ পাক দুনিয়ার কায়েম রাখনেওয়ালা এবং আখেরাতেরও কায়েম রাখনেওয়ালা।

দুনিয়ার কায়েম রাখনেওয়ালা হইলেন রিযক এবং নিয়ামত প্রদানের মাধ্যমে। আর আখেরাতের কায়েম রাখনেওয়ালা হইলেন আমলের বিনিময় প্রদানের মাধ্যমে। সুতরাং বান্দা যখন স্বীয় প্রভুর কায়েম রাখার গুনের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে স্বীয় এখতিয়ার ও ইচ্ছা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করিয়া দিবে এবং নিজকে তাঁহার অনুগত ও হুকুমের অপেক্ষমান মনে করিয়া তাঁহার সামনে নিজকে নত করিয়া রাখিবে।

অষ্টম বিষয় ঃ বান্দা স্বীয় পূর্ণ জীবন আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করায় নিয়োজিত করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে দলীল হইল আল্লাহ পাকের বাণী

وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ *

"আপনার মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপনি স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করুন।"

সুতরাং বান্দা স্বীয় পূর্ণ জীবন ইবাদত করার জন্য নিয়োগ করিলে উপায় অবলম্বন করার এবং ইহার ফিকির করার সুযোগও পাইবে না।

শায়খ আবুল হাসান (রঃ) বলেন, তোমার উপর আল্লাহ পাকের হক রহিয়াছে যে, তুমি সর্বদা আল্লাহ পাকের ইবাদত করিবে। আল্লাহ পাক তোমার প্রতিপালক। আর তোমার উপর তাঁহার ইবাদতের হক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তোমার তিনি প্রতিপালন করেন বলিয়া ইহা তাঁহার প্রতিপালনের চাহিদা। বান্দা থেকে ইবাদতের হিসাব লওয়া হইবে। সুতরাং এই হক সম্পর্কে; এমনকি তাহার প্রতিটি শ্বাস সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হইবে।

সুতরাং বিবেকবান ব্যক্তি আল্লাহর হক আদায় করিয়া নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করার এবং স্বীয় সমস্যাসমূহ সমাধান করার সুযোগ কোথায় পাইবে?

বান্দা নিজের সম্পর্কে বেফিকির হওয়া ব্যতীত, নিজের সমস্যা থেকে মুখ ফিরাইয়া স্বীয় পূর্ণ শক্তি আল্লাহর পছন্দনীয় জিনিসের প্রতি ব্যয় করা ব্যতীত, তাঁহার আনুকূল্যের মাধ্যম অধিক অর্জন করা ব্যতীত এবং তাঁহার খেদমত ও তাঁহার প্রদত্ত কার্যে সর্বদা নিয়োজিত থাকা ব্যতীত তাঁহার পূর্ণ অনুগ্রহ পর্যন্ত কেহই পৌঁছিতে পারে না।

সুতরাং তুমি নিজ থেকে যতটুকু দূরত্বে থাকিবে ততটুকু আল্লাহ পাকের কাছে থাকার সুযোগ অর্জিত হইবে। এইজন্যই শায়খ আবুল হাসান (রঃ) বলেন, হে মুক্তির পথে ধাবমান, মহান প্রভুর দরবারের আগ্রহী! যদি তুমি চাও

যে, তোমার অন্তর উর্ধ্ব জগতের রহস্যসমূহের জন্য খুলিয়া যাক; তাহা হইলে স্বীয় বাহ্যিকতার দিকে দৃষ্টি কম্ কর।

নবম বিষয় ঃ তুমি একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত গোলাম। মনিব যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ গোলামের কোন বিষয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করিয়া মনিব যখন সর্বপ্রকার উত্তম গুণাগুণের অধিকারী হন এবং স্বীয় গোলামকে কখনও নিরাশ না করেন। আর এই মনিব হইলেন আল্লাহ পাক। আল্লাহর উপর পরিপূর্ন নির্ভর করা এবং নিজকে তাঁহার কাছে সোপর্দ করাই হইল ইবাদতের প্রাণ শক্তি।

এই দুইটি বিষয় বান্দার নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করার এবং স্বীয় এখতিয়ারের পরিপন্থী। বরং বান্দার কাজ হইল যে, সে নিজকে মনিবের খেদমতে নিয়োজিত রাখিবে আর মনিব স্বীয় অনুগ্রহে নিজেই তাহার দেখা শুনা করিবেন। তাহার খোঁজ খবর নিবেন। গোলামের দায়িত্ব হইল খেদমত করা। মনিব নিজেই তাহার ভরন পোষনের ব্যবস্থা করিবেন।

এই সম্পর্কে আল্লাহ পাকের বাণী খুব ভালভাবে বুঝিয়া লও;

وَ اْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ *

"আপনি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে নামাযের হুকুম করুন ও নিজে ইহার উপর অটল থাকুন। আমি আপনার কাছে রিযক চাই না। আমিই আপনাকে রিযক দিয়া থাকি।" আল্লাহ পাকের বাণীর সারকথা হইল যে, তোমরা আমার খেদমত কর; আমি তোমার রিযক পৌঁছানের ব্যবস্থা করিব।

দশম বিষয় ঃ তোমার তো কার্যের শেষফল সম্পর্কে কোন খোঁজ খবর নাই। অনেক সময় এমনও হয় যে, কোন বিষয় উপকারী মনে করিয়া উহা করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। অথচ দেখা যায় যে, কার্যের শেষ পরিনতি হইয়া থাকে বিপরীত। আবার অনেক সময় বিপদাপদ ও মুছিবতের পথেও উপকার অর্জিত হইয়া থাকে। আবার অনেক সময় উপকার অর্জিত হইবে মনে করিয়া কোন কাজ করা হইলে শেষ পর্যন্ত হয় বিপদ। কখনও কখনও ক্ষতির পথে লাভ আর লাভের পথে হইয়া থাকে ক্ষতি। অনেক সময় মনে করে যে, মেহনত করিয়া কার্যটি সমাধা করিতে পারিবে কিন্তু হইয়া যায় অক্ষম। আবার মনে করে যে, কোন কার্যে সে অক্ষম কিন্তু তাহা অর্জন করিতে পরিশ্রম করিতে পারে। আবার অনেক সময় শত্রুর দ্বারাও উপকৃত হয়। পক্ষান্তরে অনেক ক্ষেত্রে বন্ধুর দ্বারাও কষ্ট পাইয়া থাকে। সুতরাং আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা গ্রহণের

পর নিজের ব্যবস্থা অবলম্বন করা কিভাবে একজন বুদ্ধিমানের জন্য সম্ভব হইতে পারে? অথচ তাহার খবর নাই যে, কোন জিনিসে তাহার সুখ ও শান্তি রহিয়াছে আর কোন জিনিসে তাহার জন্য ক্ষতি রহিয়াছে। তুমি কি আল্লাহ পাকের বাণী শুন নাই-

عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ *

"হয়তবা তোমরা কোন জিনিস অপছন্দ কর অথচ তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। হয়তবা তোমরা কোন জিনিস পছন্দ কর অথচ তাহা তোমাদের জন্য খারাপ।"

অনেক সময় এমন হয় যে, হয়তবা তুমি কোন জিনিসের ইচ্ছা করিয়াছ। কিন্তু আল্লাহ পাক তাহা দূরে সরাইয়া দিয়াছেন। তখন হয়ত এই কারণে অন্তরে বিষণ্নতা অনুভব করিয়াছ। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তুমি ইহার শেষ পরিণতি জানিতে পারিয়াছ তখন হয়ত তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, আল্লাহ পাক তোমার প্রতি কত অনুগ্রহ করিয়াছেন। আর তোমার তো পূর্বে এই সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। সুতরাং যে আগপিছ বুঝিতে না পারে তাহার ন্যায় খারাপ ইচ্ছাকারক আর কে হইতে পারে? যে গোলামের মধ্যে মনিবের প্রতি আনুগত্য নাই সে গোলাম অপেক্ষা অধিক বদবখত আর কে হইতে পারে? কোন এক কবি বলিয়াছেন-

☆ অনেক কাজ করিতে চাহিয়াছি আমি কিন্তু তাহা হইতে দেন নাই আপনি।

☆ সর্বদা আমার উপর রহিয়াছে আপনার আমার থেকেও অধিক মেহেরবানী।

☆ করিয়াছি পাকা পোক্ত ইচ্ছা। এখন থেকে অনুভব করিব না কোন আশংকা অন্তরে।

☆ বরং মনে করিব যে, ইহা আদেশ হইয়াছে আপনার পক্ষ থেকে।

☆ অন্তরে এই ইচ্ছাও আছে যে, আমি যাইব না। দিকে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের।

☆ আমার অন্তরে রহিয়াছে মর্যাদা বড়ত্ব আপনার।

জনৈক ব্যক্তির কাহিনী। সে যখন কোন বিপদে পতিত হইত তখন বলিত যে, ইহাতে কোন না কোন মঙ্গল রহিয়াছে। ঘটনা চক্রে এক রাত্রে এক বাঘ আসিয়া তাহার পালিত মোরগ খাইয়া ফেলিল। সে সংবাদ পাওয়ার পর বলিয়া

উঠিল যে, নিশ্চয়ই ইহাতে কোন না কোন মঙ্গল রহিয়াছে। আর ঐ রাত্রেই তাহার কুকুরের গায়ে আঘাত লাগিল। ফলে কুকুরটি মারা গেল। সে এ বিষয়টি অবগত হওয়ার পর বলিল যে নিশ্চয়ই ইহাতে কোন মঙ্গল রহিয়াছে। অতঃপর তাহার গাধা চিৎকার করা শুরু করিয়া মরিয়া গেল। ইহার সংবাদ শুনিয়াও সে বলিল যে, নিশ্চয়ই ইহাতে কোন না কোন মঙ্গল রহিয়াছে। বারবার বিপদ আসার পরও একই কথা বলার কারণে পরিবারের লোকজন তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়িল। ঘটনাচক্রে ঐ রাত্রেই শেষভাগে কিছু লোক সে মহল্লায় আসিয়া ডাকাতি শুরু করিল। কিন্তু এই ব্যক্তির ঘর ডাকাতি থেকে অব্যাহতি পাইল। ডাকাতরা মোরগ, গাধা এবং কুকুরের আওয়াজ যে ঘর হইতে শুনিয়াছে সে ঘরে ডাকাতি করিয়াছে। যেহেতু তাহার ঘরে মোরগ, গাধা এবং কুকুর কিছুই ছিল না সবই মরিয়া গিয়াছে। তাই ডাকাতরা মনে করিল যে এই বাড়ীতে কেহ বসবাস করে না। তাই তাহারা এই ঘরে ডাকাতি করিতে আসিল না। ইহাদের মৃত্যু তাহার রেহাই পাওয়ার উপায় হইয়া গেল। সুতরাং তাহার কার্যের ব্যবস্থাপক মহান আল্লাহ বড়ই হেকমতওয়ালা ও পবিত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিষয়ের শেষ ফল বান্দার সামনে প্রকাশিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার জন্য আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা গ্রহণের সৌন্দর্য বান্দার বুঝে আসে না। আল্লাহ পাকের বিশেষ বিশেষ বান্দার মাকামের সাথে এই রকম ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নাই। কেননা আল্লাহ পাক যাহাদিগকে বিবেক দিয়াছেন তাহারা কার্যের শেষ ফল প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা গ্রহণের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করিয়া লয়। এই ধরণের লোক কয়েক স্তরের হইয়া থাকে।

কতক লোক এমন রহিয়াছে যে আল্লাহ পাকের প্রতি তাহাদের গভীর সুধারণা। আল্লাহ পাকও তাহাদিগকে অবিরাম অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর মধ্যে নিমজ্জিত রাখিয়াছেন। তাই তাহারা আল্লাহর প্রতি নতশির হইয়া রহিয়াছে। কতক লোক এমন রহিয়াছে যাহাদের আল্লাহর প্রতি সুধারণা রহিয়াছে এই কারণে যে, তাহারা জানে কোন বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের দ্বারা বা ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা বা কষাকষির দ্বারা তাকদীর পরিবর্তন করা যাইবে না এবং তাহার তাকদীরে যতটুকু বন্টন করা হইয়াছে তদাপেক্ষা অধিক হাসিল করা যাইবে না।

আর কতক লোক আল্লাহ পাকের প্রতি এইজন্য সুধারণা রাখে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক বলেন, বান্দার আমার প্রতি যেরূপ ধারণা আমি বান্দার সাথে সেরূপ থাকি।

সুতরাং যে ব্যক্তি এই আশায় আল্লাহর প্রতি সুধারণা ও উহার আনুসাঙ্গিক বিষয়সমূহ অবলম্বন করে যে, তাহার সাথে আল্লাহর পক্ষ হইতে এইরূপ আচরণ হউক। তখন আল্লাহ পাক তাহার সাথে তাহার ধারণা মোতাবেক আচরণ করেন। আল্লাহ পাক মুসলমানদের জন্য অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর রাস্তা খুব সহজ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের ধারণা মোতাবেক তাহাদের সাথে আচরণ করিয়াছেন। আল্লাহ পাক নিজেই বলেন-

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ *

"আল্লাহ পাক তোমাদের সাথে আসানী করার ইচ্ছা করেন। তোমাদের সাথে কাঠিণ্যতার ইচ্ছা করেন না।"

উল্লিখিত স্তরসমূহ অপেক্ষা অধিক উচ্চস্তর হইল নিজকে সোপর্দ করা এই জন্য যে, আল্লাহ পাকই ইহার হকদার। আর নিজকে তাঁহার কাছে এই জন্য সোপর্দ করা যে, সোপর্দ করার উপকারিতার দ্বারা সে নিজেই উপকৃত হইবে। এই ধরণের সোপর্দ করা এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং ইহা অপেক্ষা নিম্নস্তরের। কেননা উপরে উল্লিখিত স্তরসমূহ কোন না কোন কারণের (শর্তের) উপর নির্ভরশীল। কেননা উপরে উল্লিখিত প্রথম স্তরের লোকেরা আল্লাহ পাকের অনুগত হইয়াছে নিজের ফায়দার জন্য। তাহা হইল আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও মেহেরবানী তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখা। যদি তাহাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ ও মেহেরবানী না হইত তাহা হইলে তাহারা অনুগত হইত না। দ্বিতীয় স্তরের লোকদের অবস্থাও তদ্রূপ। কেননা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, ব্যবস্থা অবলম্বনে কোন ফায়দা নাই। সুতরাং এই অবস্থায় যদি তাহারা ব্যবস্থা অবলম্বন পরিত্যাগ করিল তাহা হইলে আল্লাহর প্রতি তাহাদের নিজেদের সোপর্দ আল্লাহর জন্যই হইল না। কেননা ব্যবস্থা অবলম্বন যদি তাহার জন্য উপকারী বলিয়া সে বুঝিতে পারিত তাহা হইলে হয়ত বা সে ব্যবস্থা অবলম্বন পরিত্যাগ করা হইতে বিরত থাকিত।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এই জন্য অনুগত হইয়াছে এবং তাঁহার প্রতি এইজন্য সুধারণা পোষণ করা অবলম্বন করিয়াছে যে, তাহার ধারণা মোতাবেক আল্লাহ পাক তাহার সাথে আচরণ করিবেন। সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে নিজের জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহার আশংকা হইল যে, যদি আমি এইরূপ না করি তাহা হইলে আমার থেকে উত্তম জিনিসসমূহ ছুটিয়া যাইবে। সুতরাং সে তো উত্তম জিনিসসমূহ লাভের আশায় তাঁহার অনুগত হইয়া রহিয়াছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের অনুগত হয় এবং তাঁহার প্রতি এই কারণে সুধারণা রাখে যে,

তিনি তাহার উপাস্য ও প্রতিপালক। এই ব্যক্তি প্রকৃত স্থানে পৌঁছাইয়াছে। সুতরাং এই ব্যক্তি এমন এক কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে যাহার সম্পর্কে রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন আল্লাহর কোন কোন বান্দা এমনও রহিয়াছে যাহার এক তাসবীহ ওহুদ পাহাড়ের সমান।

আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে সকল বান্দাদের থেকে উপায় অবলম্বন বর্জন করার অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন

وَ اَخذ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىۡۤ اٰدَمَ مِنۡ ظُهُوۡرِهِمۡ الخ *

"যখন আপনার প্রতিপালক বনী আদমের পীঠ থেকে গ্রহণ করিয়াছেন। (শেষ পর্যন্ত)"

কেননা আল্লাহ পাককে প্রতিপালক বলিয়া স্বীকার করার অপরিহার্য ফলাফল হইল তাহার পর কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করা। আর এই অঙ্গীকার এমন এক সময় হইয়াছিল যখন মানবের নফস ছিল না। নফসই (মন) হইল দ্বিধা দ্বন্দের উৎপত্তি স্থল। আর ইহাই আল্লাহর সামনে ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করে।

যদি বান্দা পূর্বাবস্থায় থাকিত। বর্তমানে বান্দা ও প্রভুর মধ্যে যে পর্দা পড়িয়াছে তাহা যদি উঠিয়া যাইত। আর বান্দা আল্লাহকে সর্বদা স্বীয় অন্তরে হাযির রাখিত তাহা হইলে আল্লাহর সামনে ব্যবস্থা অবলম্বন করা বান্দার জন্য সম্ভবই হইত না। যেহেতু প্রভু ও বান্দার মধ্যে পর্দা বান্দাকে অন্তরাল করিয়া দিয়াছে সেহেতু তাহার দ্বারা ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে এবং সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পতিত হইতেছে। এই জন্য যাহারা আল্লাহর মারেফাত লাভ করিয়াছেন এবং উর্ধ্বজগতের রহস্যসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারা আল্লাহর সামনে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না। কেননা প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দেয়া না। এমনকি সুদৃঢ় অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে হাযির আছে আর তাঁহার বড়ত্ব ও মহত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সে কিভাবে আল্লাহর মোকাবিলায় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে?

হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনা

ফায়দাঃ- বান্দার জন্য আল্লাহ পাক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইহার বান্দা নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং স্বীয় এখতিয়ার প্রদর্শন করার মুছিবত খুব ভয়ানক। ইহার বিপদ বড়ই শক্ত। হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনাকে তলাইয়া দেখিলে ইহা বুঝা যায়। তিনি নিজের জন্য নিজে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আর এই ব্যবস্থা অবলম্বন স্বরূপ গাছের ফল খাইয়াছিলেন। ঘটনার বিবরণ

কুরআনে বর্ণিত রহিয়াছে। শয়তান হযরত আদম (আঃ)-এর সামনে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল যে-

مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنۡ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَا مَلَكَيۡنِ اَوۡ تَكُوۡنَا مِنَ الۡخٰلِدِيۡنَ *

তোমাদের পরোয়ারদিগার তোমাদিগকে এই গাছ থেকে (ফল) ভক্ষণ করিতে শুধু এই কারণে নিষেধ করিয়াছেন যে, (এই গাছের ফল খাইলে) তোমরা ফিরিশতা হইয়া যাইবে অথবা তোমরা তথায় চিরস্থায়ী বসবাসকারী হইয়া যাইবে। শয়তানের এই কথা হযরত আদম (আঃ)-এর মধ্যে যে চিন্তার উদ্রেক করিয়াছিল তাহা হইল এই যে, মানুষ ফিরিশতায় পরিণত হওয়ার সুযোগ আর বেহেশতে চিরস্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ পাওয়া যাইতেছে। বেহেশতে সর্বদা থাকার অর্থ আল্লাহর সান্নিধ্যে সর্বদা থাকা। আর স্বীয় প্রিয়ের কাছে সর্বদা অবস্থান করার সুযোগ পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের কথা। অধিকন্তু ফিরিশতায় পরিণত হওয়ার আকঙ্খা তাহার অন্তরে হয়তবা এই জন্য প্রাধান্য পাইয়াছিল যে ফিরিশতার গুণাবলীসমূহ উত্তম অথবা তিনি ফিরিশতাকে উত্তম মনে করিতেন। এইসব দিকে খেয়াল করিয়া গাছের ফল খাইলেন। আর তাহার এই নিজস্ব ব্যবস্থা অবলম্বনের কারণেই তাহার উপর আপদ আসে। অধিকন্তু আল্লাহ পাকেরও সিদ্ধান্ত ছিল তাহাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করার এবং পৃথিবীর বুকে তাহাকে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করার। সুতরাং বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে প্রেরণ করার দ্বারা তাহার মর্যাদার অবনিত হইয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় যে, বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার মর্যাদার উন্নতি হইয়াছে। এইজন্য শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর কসম! হযরত আদম (আঃ)-এর মর্যাদার অবনতির জন্য তাহাকে পৃথিবীতে অবতরণ করানো হয় নাই বরং তাঁহাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানের জন্য অবতরণ করানো হইয়াছে। সুতরাং আদম (আঃ) দিন দিন উন্নতির দিকে চলিয়াছেন। কখনও আল্লাহর নৈকট্য ও বিশেষত্বের মধ্যে। আবার কখনও কান্নাকাটির মধ্যে। আবার কখনও পরিপূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়। প্রত্যেক ঈমানদারদের জন্য এতটুকু বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব যে, নবী ও রাসূলগণের যখন কোন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তখন তাহার অবস্থায় পরিপূর্নতা আসে। অর্থাৎ তাহার অবস্থার পরিবর্তন হইয়া যে অবস্থায় পতিত হয় তাহা পূর্বাবস্থা হইতে অধিক পরিপূর্ণ হয়। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের এক ইরশাদ স্বরণ কর।

وَ لَلۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ لَّكَ مِنَ الۡاُوۡلٰى *

হযরত ইবনে আতিয়া (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন

আপনার জন্য পরবর্তী অবস্থা প্রথমাবস্থা অপেক্ষা উত্তম। উল্লিখিত বিষয়টি বুঝিয়া লওয়ার পর আরও একটি বিষয় বুঝিয়া লও। তাহা হইল এই যে, বান্দার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ইচ্ছা আল্লাহ পাকের গুন। আল্লাহর ইচ্ছায় সিদ্ধান্ত হইয়া রহিয়াছে যে, তিনি মানবের দ্বারা পৃথিবীকে আবাদ করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা মোতাবেক পৃথিবীতে ভাল ভাল লোকও থাকিবে আর নিজের উপর অত্যাচারীও থাকিবে। আর তাঁহার এই ইচ্ছা পুরা হওয়ার এবং দৃশ্য জগতে ইহার প্রকাশ তাঁহার ব্যবস্থা গ্রহণ ও হেকমতের ফল। সুতরাং হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক এই বৃক্ষের ফল খাওয়া তাহার দুনিয়াতে আগমনের কারণ হওয়া এবং তাহার দুনিয়াতে আগমন তাহার খিলাফতের মর্যাদার প্রকাশ পাওয়ার উপায় হওয়া আল্লাহ পাকের চাহিদা ছিল। এইজন্য শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, ঐ বিপদ কত বরকতময় যাহা খিলাফতের মর্যাদা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে এবং পরবর্তী লোকদের জন্য তাওবা করার কানুন নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং আকাশ যমীনের সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ পাকের ফয়সালার মাধ্যমে তাহার পৃথিবীতে আগমন নির্ধারিত হইয়াছিল। শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাহাকে পৃথিবীতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছিল। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً *

"নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিয়োগ করিব।" মোটকথা হযরত আদম (আঃ)-এর বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করা, পৃথিবীতে তাহার আগমন এবং খিলাফত ও ইমামতির মর্যাদার দ্বারা সম্মানিত হওয়া প্রভৃতি আল্লাহ পাক কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থার সৌন্দর্য। এই পর্যন্ত আলোচনার পর আমরা এই ঘটনা থেকে এমন কতগুলি ফায়দা ও বৈশিষ্ট্য তালাশ করিব যাহা আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)কে দান করিয়াছেন। যাহাতে আমরা অবগত হইতে পারি যে, আল্লাহ পাকের সাথে বিশেষ বিশেষ লোকদের এমন সম্পর্ক রহিয়াছে যাহা অন্যান্য লোকদের নাই এবং তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন যাহা অন্যান্যদের জন্য গ্রহণ করেন নাই।

হযরত আদম (আঃ)-এর বৃক্ষের ফল খাওয়ার এবং তাহার দুনিয়াতে অবতরণের ঘটনার মধ্যে কতগুলি ফায়দা রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি ফায়দা হইল বেহেশতের মধ্যে হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়ার আল্লাহ পাকের যেসব গুনের সাথে পরিচিত ছিলেন তাহা হইল রিযক প্রদান, দান, এহসান ও অনুগ্রহ। আল্লাহ পাক তাহাদের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে

তাহাদের প্রতি বিশেষভাবে মেহেরবানী করার পন্থাও গ্রহণ করিয়াছেন। আর এই বিশেষ মেহেরবানীর চাহিদা ছিল যে, তাহারা উভয়ে এই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে। আর ইহার ফলশ্রুতিতে তাহারা আল্লাহ পাকের সহিষ্ণুতা, ঢাকিয়া রাখা, ক্ষমা করিয়া দেওয়া, তাওবা কবুল করা ও বান্দাকে কবুল করিয়া লওয়া প্রভৃতি গুনের সাথে পরিচিত হইতে পারেন। সহিষ্ণুতার গুনের সাথে এইভাবে পরিচয় হইয়াছিল যে, আল্লাহ পাক তাহাদের এই কার্যের শাস্তি সাথে সাথে প্রদান করেন নাই। সহিষ্ণু এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যে, কোন অপরাধের শাস্তি সাথে সাথে দেন না বরং অপরাধীকে অবকাশ দেন; অতঃপর হয়ত মাফ করিয়া দেন অথবা ধর পাকড় করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আল্লাহ পাক ঢাকিয়া রাখা বা গোপন করিয়া রাখার গুণের সাথে তাহাদিগকে এইভাবে পরিচিত করাইলেন যে, তাহারা বৃক্ষের ফল খাওয়ার পর যখন তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া লজ্জাস্থান প্রকাশ হইয়া পড়িল; তখন আল্লাহ পাক বেহেশতের পাতা দ্বারা তাহাদের লজ্জাস্থান ঢাকিয়া দিলেন। আল্লাহ পাক নিজেই বলেন-

وَ طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ *

"এবং তাহারা উভয়ে বেহেশতের পত্র নিজেদের দেহের উপর মিলাইয়া মিলাইয়া রাখিতে লাগিল।" ইহা তাহার ঢাকিয়া রাখার গুণ।

তৃতীয় কথা আল্লাহ পাক তাহাদিগকে এইকথা অবগত করানোর ইচ্ছা করিলেন যে, তোমরা আমার মকবুল ও পছন্দনীয় বান্দা। আল্লাহ পাকের এই কবুলের মাধ্যমে তাহাদের মধ্যে দুইটি মর্যাদা স্থান লাভ করিল। এক, আল্লাহ পাকের দিকে তাহাদের প্রত্যাবর্তন করা ও তাওবা করা। দ্বিতীয়, আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে হেদায়েত। সুতরাং আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হইল তাহাদিগকে পছন্দ হওয়ার কথা এবং তাহাদের প্রতি পূর্বে অবতীর্ণ অনুগ্রহের কথা হযরত আদম (আঃ)কে স্বরণ করাইয়া দেওয়া। তাই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করা তিনি তাহাদের নির্ধারিত করিলেন। আর ফল খাওয়ার পরও তিনি তাহাদের থেকে বিমুখ হইলেন না। এমনকি তাহাদের প্রতি সাহায্য প্রেরণ করাও ক্ষান্ত করিলেন না। বরং এমতাবস্থায় স্বীয় ভালবাসা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। যেমন কোন কোন বুযুর্গ বলেন যে, যাহার প্রতি অনুগ্রহ থাকে তাহার অপরাধ ক্ষতিকর হয় না। কোন কোন বন্ধুত্ব এমন রহিয়াছে যে, বন্ধুর বিরোধিতার দ্বারা বন্ধুত্ব কাটিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত বন্ধুত্ব হইল এমন বন্ধুত্ব যাহা বন্ধু চিরস্থায়ী রাখে। অপর পক্ষ তাহার অনুকূলে থাকুক বা প্রতিকূলে থাকুক। আল্লাহ পাক বলেন-ثم

اجتباه ربه "অতঃপর তাহার প্রভু তাহাকে পছন্দ করিয়া লইলেন।" তবে ইহার অর্থ এই নহে যে, তিনি তাহাদিগকে এই মাত্র পছন্দ করিয়া লইলেন। আগে করিতেন না। বরং আদম (আঃ)-এর অস্তিত্বের পূর্ব হইতেই তাহাকে পছন্দ করিতেন। তবে তাহার পছন্দ করার বাহ্যিক প্রকাশটা এখন হইয়াছে। আল্লাহ পাক ইহাকেই বলিয়াছেন ثم اجتباه ربه অর্থাৎ তাহাদিগকে তাওবার তৌফিক প্রদান করিয়া তাহাদিগকে পছন্দ করা নামক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدٰى *

"অতঃপর তাঁহার প্রভু তাহাকে পছন্দ করিয়া লইলেন। তাঁহার তাওবা কবুল করিলেন ও হেদায়েত দান করিলেন।"

এই আয়াতে তিন বিষয়ের উল্লেখ করিলেন। প্রথমতঃ তাহাকে পছন্দ করা, কবুল করা। দ্বিতীয়তঃ তাওবা কবুল করা। ইহার শেষ ফল তাহাকে পছন্দ ও কবুল করা। তৃতীয়তঃ হেদায়েত প্রদান করা, ইহার ফলকথা তাওবা কবুল করা। বিষয়টি খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। অতঃপর তাহাদিগকে পৃথিবীতে অবতরণ করাইয়া স্বীয় হেকমতের গুণের সাথে পরিচিত করিলেন। যেমন তাহাদিগকে বেহেশতে রাখিয়া স্বীয় শক্তির প্রাধান্যের সাথে পরিচিত করাইয়া ছিলেন।

পৃথিবী দারুল আসবাব। এখানে কোন না কোন বস্তুর মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিতে হয় স্বীয় জীবন ধারণের উপজীবিকা হিসাবে। তাই হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করার পর তাহাকে হাল চাষ করা, বীজ বপন করা এবং জীবন পরিচালনার জন্য অন্যান্য যে সব বিষয়ের প্রয়োজন তাহা শিক্ষা দেওয়া হইল। কেননা তাহাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করার পূর্বেই তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে,

فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى *

"শয়তান যেন তোমাদিগকে বেহেশত থেকে বাহির না করিয়া দেয়। তাহা হইলে তুমি কষ্টে পতিত হইবে।"

আর হযরত আদম (আঃ)-কে জীবনযাপনের জন্য যে সব কার্য শিক্ষা দেওয়া হইল তাহা সবই কষ্টের কাজ। এই কার্যগুলি শিক্ষা দিয়া আল্লাহ পাক স্বীয় ভবিষ্যত বাণী প্রমাণ করিলেন। উল্লিখিত আয়াতে تشقى শব্দের অর্থ করা হইয়াছে যে, তুমি কষ্টে পতিত হইবে। তুমি বদবখত হইয়া যাইবে। এই অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই।

কষ্টে পতিত হওয়ার অর্থ গ্রহণ করার পক্ষে দলীলও রহিয়াছে, আয়াতে

تشقى শব্দটি এক বচন। তাই এই শব্দ দ্বারা শুধু হযরত আদম (আঃ)কে বুঝানো হইয়াছে। দুই বচন ব্যবহার করা হয় নাই। দুই বচন ব্যবহার করা হইলে হযরত আদম ও হযরত হাওয়া উভয়ে বুঝাইত। কষ্ট পুরুষকে বহন করিতে হয়। নারীর উপর কষ্টের বোঝা চাপে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ *

"পুরুষগণ নারীদের তত্ত্বাবধানকারী আল্লাহ পাক প্রাধান্য দেওয়ার কারনে।"

যদি এখানে হতভাগ্য হওয়ার অর্থ গ্রহণ করা হইত তাহা হইলে দুই বচন ব্যবহার করা হইত। হতভাগ্য হয় যখন সম্পর্ক ছেদ হয় আর সম্পর্কে পর্দা পড়িয়া যায়। এই ক্ষেত্রে উভয় সমান। এক বচন ব্যবহার করিয়া একজনকে বুঝানোর কোন কারণ নাই। যদি দুই বচনও ব্যবহৃত হইত। তবুও তাহাদের প্রতি সুধারণা পোষণ পূর্বকঃ বাহ্যিক কষ্টের অর্থই গ্রহণ করা হইত।

একটি বড় ফায়দার কথা

হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ তাঁহার অবাধ্যতা ও নির্দেশ অমান্য করার পন্থায় হয় নাই। হয়তোবা তিনি ভুল করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছেন। ফল খাওয়ার সময় নিষেধাজ্ঞার কথা স্বরণ ছিল না। কোন কোন তফসীরকার এই মতও ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক ইহাই বুঝাইয়াছেন-

فَنَسِىَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا *

"সে ভুলিয়া গিয়াছে এবং আমি তাহার মধ্যে দৃঢ়তা পাইলাম না।"

অথবা ইহাও হইতে পারে যে, ফল খাওয়ার সময় নিষেধাজ্ঞার কথা স্মরণ ছিল। কিন্তু শয়তান আল্লাহর নামে শপথ করিয়া তাহাকে প্রতারিত করিল যে, এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে আল্লাহ পাক নিষেধ করিয়াছেন যাহাতে আপনারা এখানে চিরস্থায়ী না হইতে পারেন অথবা আপনারা ফিরিশতায় পরিণত না হইতে পারেন। কারণ এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার অপরিহার্য ফল হইল ফিরিশতায় পরিণত হওয়া অথবা বেহেশতে চিরস্থায়ী হইয়া যাওয়া। যেহেতু তাহারা আল্লাহ পাকের প্রেমিক ছিলেন। আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে থাকার জন্য পাগলপরা ছিলেন। তাই তাহারা আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে থাকার আকাঙ্খা লইয়া ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অথবা ফিরিশতায় পরিণত হওয়ার আশায়। তিনি ফিরিশতায় পরিণত হওয়া পছন্দ করিয়াছিলেন এই জন্য যে, তিনি তো

স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, ফিরিশতাগণ আল্লাহ পাকের কত নিকটের। তাই ফিরিশতাদের মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার আকাঙ্খা লইয়া ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি ধারনা করিয়াছিলেন যে, ফিরিশতাগণ উত্তম। অধিকন্তু উলামাদের মধ্যে ফিরিশতা ও নবীগণের প্রাধান্য লইয়া মতবিরোধও রহিয়াছে। এই অবস্থায় যখন এই অভিশপ্ত শয়তান শপথ করিয়া বলিতে লাগিল যে, আমি তোমাদের কল্যণকামী। তখন আদম (আঃ) ধারণাও করিতে পারেন নাই যে, আল্লাহর নামে শপথ করিয়া কেহ মিথ্যা বলিতে পারে। তাই তিনি তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। শেষ পর্যন্ত তাহাই হইল যাহা আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, "শয়তান তাহাদের উভয়কে ধোকায় ফেলিয়া দিয়াছে।"

ফায়দা ঃ হযরত আদম (আঃ) বেহেশতে থাকা অবস্থায় পানাহার করিতেন কিন্তু উহার ফলে মলমূত্র ত্যাগ করার প্রয়োজন হইত না। বরং পানাহারের পর তাহার শরীর থেকে ঘাম বাহির হইয়া আসিত। আর সে ঘামে মেশক আম্বরের ন্যায় সুগন্ধ ছিল। নেককার ব্যক্তিগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করিবেন তখন তাহাদের পানাহারের পরও এই অবস্থা হইবে। হযরত আদম (আঃ) ফল ভক্ষণ করার পর তাঁহার উদরে ব্যথা হইয়াছিল। ফলে তাহার মলত্যাগ করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। তখন তাহাকে বলা হইল যে, হে আদম! এখানে মলত্যাগ করার সুযোগ কোথায়? চৌকির উপর না পালঙ্কের উপর না নহরের কিনারে? এখানে তো কোথায়ও মলত্যাগ করার সুযোগ নাই। মলত্যাগ করার স্থান পৃথিবী।

সুতরাং গোনাহের মাধ্যমের প্রভাব যখন হযরত আদম (আঃ) পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে তাহা হইলে বাস্তবক্ষেত্রে গোনাহের প্রভাব গোনাহগার পর্যন্ত কেন পৌঁছিবে না। বিষয়টি খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও।

সতর্ক ঃ এই ঘটনার উদাহরণ তোমার নিজের মধ্যে বুঝিয়া লও। মনে কর তোমাকে যাহা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে তাহা নিষিদ্ধ বৃক্ষের তুল্য। বেহেশত আল্লাহর সান্নিধ্যের তুল্য। তোমার অন্তর হযরত আদম (আঃ)-এর তুল্য। আর হযরত হাওয়া তোমার নফসের তুল্য। যেন উভয়কে বলা হইতেছে যে, তোমরা এই নিষিদ্ধ বৃক্ষের অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজের দিকে যাইবে না। তবে পার্থক্য এইটুকু যে, হযরত আদম (আঃ) অনুগ্রহের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন। তাহারা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার পর উভয়কে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কষ্ট উভয়ের হইয়াছিল। কিন্তু তুমি যদি নিষিদ্ধ কাজ কর তাহা

হইলে তুমি আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইবে। ইহাতে তোমার অন্তর কষ্টে পতিত হইবে। আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কষ্ট তোমার অন্তর ভোগ করিবে কিন্তু নফস ভোগ করিবে না। কেননা এই সময় নফস স্বীয় স্বভাব মোতাবেক জিনিসে ডুবা থাকিবে। অর্থাৎ খাহেশ, কুপ্রবৃত্তি এবং গাফলতে ডুবিয়া থাকিবে।

তরতীব ও বয়ান

আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)কে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন সৃষ্টি করার গুণের দ্বারা। তাই তিনি আল্লাহ পাককে يا قدير (হে শক্তিমান) বলিয়া ডাকিয়াছেন। অতঃপর নিজের পরিচয় দিয়াছেন ইচ্ছা করার গুণের মাধ্যমে। তাই তিনি তাহাকে يا مريد (হে ইচ্ছাকারী) বলিয়া ডাকিয়াছেন। অতঃপর নির্দেশ দেওয়ার গুণের মাধ্যমে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন। যেমন বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তখন তাহাকে يا حاكم (হে নির্দেশদাতা) বলিয়া ডাকিয়াছেন। অতঃপর তাহার জন্য বৃক্ষের ফল নির্ধারিত করিলেন। তখন তিনি তাহাকে يا قاهر (হে পরাক্রমশালী) বলিয়া ডাকিয়াছেন। কিন্তু ফল খাওয়ার পর সাথে সাথে শাস্তি প্রদান করেন নাই। তখন তিনি তাহাকে يا حليم (হে ধৈর্যশীল) বলিয়া ডাকিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাহাকে এই বিষয়ে লজ্জিত করেন নাই। তাই তিনি তাহাকে يا ستار (হে গোপনকারী) বলিয়া ডাকিয়াছেন। অতঃপর তাহার তাওবা কবুল করিয়াছেন বলিয়া হযরত আদম (আঃ) তাহাকে يا تواب (হে তাওবা কবুল কারী) বলিয়া ডাকিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাহাকে প্রত্যক্ষ করাইলেন যে তিনি বৃক্ষের ফল খাওয়ার পরও আল্লাহ পাক তাহার থেকে বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন করেন নাই। তখন তিনি তাহাকে يا ودود (হে মহব্বতকারী) বলিয়া ডাকিয়াছেন। অতঃপর তাহাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন এবং জীবন চলার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহজলভ্য করিয়া দিলেন। তখন তিনি তাহাকে يا لطيف (হে মেহেরবান) বলিয়া ডাকিলেন। অতঃপর স্বীয় আহকাম পালন করার শক্তিদান করিলেন। তখন তিনি তাহাকে يا معين (হে সাহায্যকারী) বলিয়া ডাকিলেন। অতঃপর ফল খাওয়া নিষেধ করার, ফল আহার করানোর এবং পৃথিবীতে প্রেরণ করার রহস্যসমূহ তাহাকে প্রত্যক্ষ করাইলেন। তখন তিনি তাহাকে يا حكيم (হে হেকমতওয়ালা) বলিয়া ডাকিলেন। অতঃপর তাহাকে শত্রু এবং ধোকাবাজ শয়তানের উপর জয়ী করিলেন। তখন يا نصير (হে সাহায্যকারী) বলিয়া ডাকিলেন। অতঃপর আল্লাহর বন্দেগী করার গুণ অর্জন করার ক্ষেত্রে তাহাকে সহায়তা করেন। তখন

يا ظهير (হে সহায়তাকারী) বলিয়া ডাকিলেন।

হযরত আদম (আঃ)কে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল তসরীফী আহকাম পরিপূর্ণ করার জন্য এবং তাকলিফী আহকামের ক্ষেত্রে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তিনি উভয় ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা অর্জন করিয়াছিলেন। তসরীফী আহকাম পালন করার ক্ষেত্রেও এবং তাকলিফী আহকাম পালন করার ক্ষেত্রেও। সুতরাং তাহার প্রতি আল্লাহ পাকের বড় অনুগ্রহ ও এহসান।

প্রকৃত আলোচনার দিকে প্রত্যাবর্তন

বান্দার জীবনে যতগুলি পর্যায় আসে তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় পর্যায় হইল বান্দা হওয়ার পর্যায়। বান্দা হইয়া থাকা তাহার উচিত। অন্যান্য পর্যায় বান্দার এই পর্যায়ের অধীনস্থ। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন কুরআনে পাকে আসিয়াছে-

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً *

"ঐ মহান সত্ত্বা পবিত্র। যিনি স্বীয় বান্দা (দাস)কে রাত্রে সফর করাইয়াছেন।"

ما انزلنا على عبدنا *

"আমি স্বীয় বান্দার উপর যাহা নাযিল করিয়াছি।"

كهيعص ذكر رحمة ربك عبده زكريا *

"আপনার প্রতিপালকের দাস যাকারিয়ার প্রতি তাঁহার রহমতের আলোচনা।"

لما قام عبد الله يدعوه *

"যখন আল্লাহর বান্দা তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে দণ্ডায়মান হইলেন।"

উল্লিখিত আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বান্দা বলা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন বাদশাহ নবী হওয়ার বা বান্দা নবী হওয়ার এখতিয়ার দেওয়া হইয়াছিল তখন তিনি বান্দা হওয়ার দিকটি অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা আমাদের বড় প্রমাণ যে, বান্দা হওয়ার পর্যায় সমগ্র পর্যায় অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহর নৈকট্যের যতগুলি পন্থা রহিয়াছে তন্মধ্যে ইহার স্থান সর্বাগ্রে। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আমি তো বান্দা। তাই আমি হেলান দিয়া আহার করি না। আমি তো দাসের ন্যায় আহার করি।

তিনি আরও বলেন যে, আমি সমগ্র বনী আদমের নেতা। আমি ইহা গর্ব করিয়া বলিতেছি না।

শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ) বলেন, "আমি গর্ব করিয়া বলিতেছিনা" ইহার অর্থ আমি নেতৃত্বের জন্য গর্ব করিতেছিনা। আমার গৌরব হইল দাস হইয়া থাকার মধ্যে। আর এই জন্য আমার সৃষ্টি হইয়াছে। আল্লাহ পাক বলেন-

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ *

"আমি জ্বীন ও ইনসান জাতি শুধু এইজন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা আমার ইবাদত করিবে।"

ইবাদত হইল বান্দা হইয়া থাকার বহিঃপ্রকাশ। আর বান্দা (দাস) হইয়া থাকা ইবাদতের প্রাণ। এতটুকু হৃদয়ঙ্গম করার পর এখন ভাল করিয়া বুঝিয়া লও যে, বান্দা হিসাবে থাকার প্রাণ হইল স্বীয় এখতিয়ার বর্জন করা এবং তাকদীরের মোকাবিলা না করা। সুতরাং এখান থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে বান্দা হইয়া থাকার সারকথা হইল, আল্লাহ পাক বান্দার জন্য যেহেতু ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন সেহেতু বান্দা নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করিবে এবং তাঁহার সামনে স্বীয় সর্বপ্রকার এখতিয়ার বর্জন করিবে। সুতরাং যেহেতু বান্দা হইয়া থাকার পর্যায়ের পরিপূর্ণতা বান্দার পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করার উপর নির্ভরশীল; সেহেতু বান্দার উচিত নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করা এবং পরিপূর্নভাবে নিজকে আল্লাহর কাছে অর্পন করা যাহাতে সে উচ্চতর মর্যাদা ও উত্তম মনযিল পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে।

একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিতে পাইলেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) কুরআন তিলাওয়াত করিতেছেন, কিন্তু খুব স্বল্প আওয়াজে অর্থাৎ প্রায় নিরব অবস্থায় পাঠ করিতেছেন। পক্ষান্তরে শুনিতে পাইলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ)ও কুরআন পাঠ করিতেছেন কিন্তু খুব জোরে জোরে পাঠ করিতেছেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি এত নিম্নস্বরে পাঠ করিতেছ কেন? তিনি আরজ করিলেন আমি যাহার কাছে কথা বলিতেছিলাম তিনি তো শুনিতে পাইতেছিলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এত জোরে জোরে পড়িতেছ কেন? তিনি আরয করিলেন আমার উদ্দেশ্য হইল

নিদ্রিত লোকদের জাগ্রত করা এবং শয়তানকে বিতাড়িত করা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)কে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আরও সামান্য উচ্চ আওয়াজে পাঠ করেন। আর হযরত ওমর (রাঃ)–কে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আওয়াজ অপেক্ষাকৃত নিম্ন করিয়া দেন।

আমাদের শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ) বলেন, এখানে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইচ্ছা ছিল উভয়কে স্বীয় অভিমত থেকে সরাইয়া দেওয়া এবং স্বীয় অভিমতের দিকে আনয়ন করা।

সতর্কতা ঃ- উল্লিখিত হাদীছে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করা তোমার ইবাদত। কেননা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে তাহাদের কৃতকর্মের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন তখন উভয়ে নিজ নিজ কর্মের কারণ এবং খালেছ ইচ্ছার কথা বর্ণনা করিলেন। ইহা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে নিজেদের ইচ্ছা ও এখতিয়ার হইতে পৃথক করিয়া স্বীয় এখতিয়ারের দিকে আনয়ন করিলেন।

তীহ্ ময়দানের ঘটনা

বনী ইসরাঈল যখন তীহ্ প্রান্তরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং মান্না ও সালওয়া নামক খাদ্য পাইতে শুরু করিল। আল্লাহ পাক তাহাদের খাদ্য হিসাবে ইহাই নির্ধারিত করিয়াছিলেন। এই খাদ্য মেহনত ও পরিশ্রম ব্যতীত একমাত্র আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা এই ধরনের খাদ্যের অভ্যাসী ছিল না। অধিকন্তু বান্দার জন্য আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা গ্রহণের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাহাদের নসীব হয় নাই। ফলে তাদের স্বভাব মোতাবেক তাহারা পুরাতন অভ্যাসের দিকে আকৃষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল যে, হে মুসা (আঃ)! আপনি স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাদের জন্য শাক শবজী, তরিতরকারী, কাকড়ী, রসূন, মুশুরী, পিয়াজ প্রভৃতি জমি হইতে নির্গত করিয়া দেন। তখন হযরত মুসা (আঃ) বলিলেন, তোমরা উত্তম জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস লইতে চাও। তাহা হইলে তোমরা শহরে যাও সেখানে তোমাদের চাহিদা মোতাবেক জিনিস মিলিবে। অতঃপর তাহাদের উপর অপদস্থতা ও লাঞ্ছনা অবতীর্ণ হইল। তাহারা আল্লাহর গোস্বায় পতিত হইল। তাহাদের প্রতি আল্লাহর গোস্বা ও লাঞ্ছনা অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, তাহারা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় জিনিসসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের পছন্দনীয় জিনিসসমূহ অবলম্বন করিয়াছিল। অথচ আল্লাহর পছন্দনীয় জিনিসমূহ

তাহাদের অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তাই আল্লাহ পাক ধমকির সুরে তাহাদিগকে বলিলেন-

اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ *

"তবে কি তোমরা উৎকৃষ্ট জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করিতে চাও।"

অত্র আয়াতের বাহ্যিক তফসীর এই যে, তবে কি তোমরা মান্না-সালওয়ার পরিবর্তে রসূন, পিয়াজ ও মুশুরী প্রভৃতি চাহিতেছ? মান্না সালওয়া প্রকৃত মজাদার জিনিস এবং মেহনত পরিশ্রম ব্যতীত অর্জিত হয়।

সুতরাং পিয়াজ, রসূন প্রভৃতি কখনও মান্না সালওয়ার সমকক্ষ হইতে পারে না। কেননা তোমাদের কাঙ্খিত জিনিসসমূহ মান্না-সালওয়ার মত মজাদার নয়। অধিকন্তু এইগুলি মেহনত পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত হয়। তাই ইহার সাথে বিপদাপদ লাগিয়াই থাকে। অত্র আয়াতের তত্ত্বকথা হইল তোমরা যাহা অবলম্বন করিয়াছ তাহা নিকৃষ্ট জিনিস। আর আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য যাহা পছন্দ করিয়াছেন তাহা উৎকৃষ্ট। অথচ তোমরা উৎকৃষ্ট জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস পাইতে চাহিতেছ?

আল্লাহ পাক বলেন-

اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَا سَاَلْتُمْ *

"তোমরা শহরে যাও। সেখানে তোমরা যাহা চাহিতেছ তাহা লাভ করিতে পারিবে।"

ইহার তত্ত্বকথা এই যে, যেহেতু আসমানী ব্যবস্থা তোমাদের পছন্দনীয় নয় বরং যমিনী ব্যবস্থা পছন্দনীয়। সুতরাং আসমানী ব্যবস্থার পরিবর্তে যমিনী ব্যবস্থার প্রতি চল এবং অপদস্থতা ও লাঞ্ছনার মধ্যে নিমজ্জিত হও। কেননা, তোমরা আল্লাহর ব্যবস্থা ছাড়িয়া নিজেদের ব্যবস্থা ও এখতিয়ার গ্রহণ করিতেছ।

যদি এই উম্মত তীহ্ ময়দানে হইত তাহা হইলে বনী ইসরাঈল যাহা বলিয়াছে তাহা অবশ্যই বলিত না। কেননা তাহাদের নূর পরিষ্কার। তাহাদের ভেদ ও রহস্য অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, তাহারা কি বলিয়াছিল? বনী ইসরাঈল হযরত মুসা (আঃ)কে বলিয়াছিল-

اذهب انت و ربك فقاتلا انا ههنا قعدون *

"হে মুসা! আপনি এবং আপনার প্রভু গিয়া লড়াই করুন। আমরা এখানেই বসিয়া থাকিব।" আর এই কারণেই তাহারা তীহ প্রান্তরে নজরবন্দী হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা বলিয়াছিল যে, হে মুসা! আপনি স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দোয়া করুন। তিনি যেন আমাদিগকে পিয়াজ, রসুন, মুশুরী, তরকারী প্রভৃতি দান করেন।

প্রথমে উল্লিখিত ক্ষেত্রে তো তাহারা আল্লাহর অনুগত হইতে অস্বীকার করিয়াছে। আর পরে উল্লিখিত ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় জিনিস পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের পছন্দনীয় জিনিস অবলম্বন করিয়াছে। এইভাবে বারবার তাহাদের দ্বারা এমন সব কাজ হইয়াছে যাহা থেকে বুঝা যায় যে, তাহারা হাকীকত ও তরীকত সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর ছিল। তাই তাহারা কখনও বলিত যে, ارنا الله جهرة "আমাদের সামনাসামনি পরিষ্কারভাবে আল্লাহকে দেখাইয়া দিন।" কখনও হযরত মুসা (আঃ)কে ফরমায়েশ দিয়া বলিত যে, اجعل لنا الها كما لهم الهة "এইসব লোকদের অনেক উপাস্য রহিয়াছে। অনুরূপভাবে আমাদের জন্য একটি উপাস্য বানাইয়া দিন।" এই ঘটনাটি ছিল দরিয়া পার হওয়ার পরের ঘটনা। নদী পার হইয়া এক সম্প্রদায়কে দেখিতে পাইল তাহারা নিজেদের প্রতিমার সামনে জমিয়া বসিয়া আছে। তাহাদেরকে মুর্তি পুজা করিতে দেখিয়া তাহারা এই আবেদন করিল অথচ এই কেবল তাহারা আল্লাহর কুদরত দেখিয়া আসিয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে তাহারা এমনই ছিল। যেমন হযরত মুসা (আঃ) তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, তোমরা এমন লোক যে, তোমরা মূর্খের ন্যায় কাজ করিয়া বস।" অনুরূপভাবে আল্লাহ পাক তাহাদের অন্য এক অবস্থাও বর্ণনা করিতেছেন,

وَ اِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّ ظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ *

"যখন আমি ছায়াদার ছাদের ন্যায় পাহাড়কে তাহাদের উপর উঠাইয়া ধরিয়াছি। তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল যে, যেন ইহা তাহাদের উপর পতিত হইতেছে। তখন তাহাদের প্রতি নির্দেশ হইল যে, আমি তোমাদিগকে যে হুকুম দিয়াছি তাহা খুব শক্ত করিয়া ধর।"

পক্ষান্তরে এই উম্মত স্বীয় অন্তরের মধ্যে পাহাড়সম সাহস ও মর্যাদা বহন করিতেছে। ঈমানী শক্তির মাধ্যমে আল্লাহর কিতাব অবলম্বন করিয়াছে। ইহার উপর অটল রহিয়াছে। আর এই বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। গরুর বাছুরের পুঁজা করা হইতে বাঁচিয়া রহিয়াছে। আল্লাহ পাক এই

উম্মতকে পছন্দ করিয়াছেন। তাহাদের প্রতি নাযিলকৃত আহকাম তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন। নিজেই তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ *

"তোমরা উত্তম উম্মত। তোমাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে মানুষের উপকারের জন্য।" অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا *

"এবং অনুরূপভাবে আমি তোমাদিগকে মধ্যমপন্থী সম্প্রদায় করিয়াছি।"

ইহা হইতে তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, নিজে ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং স্বীয় এখতিয়ার খাটানো বড় শক্ত গোনাহ ও বিপদ। যদি তুমি চাও যে, আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে তোমার জন্য ভাল ফয়সালা হউক তাহা হইলে তুমি নিজের জন্য নিজের পছন্দ বর্জন কর। আর যদি চাও যে, তোমার জন্য উত্তম ব্যবস্থা গৃহীত হউক তাহা হইলে নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বনের আকাঙ্খা ত্যাগ কর।

যদি তুমি স্বীয় উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌছিতে চাও তাহা হইলে তোমার জন্য একটি রাস্তা খোলা রহিয়াছে। তাহা হইল তাহার সামনে তোমার কোন উদ্দেশ্যই থাকিবে না। হযরত বায়েজীদ (রহঃ)কে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, আপনারা কি চান? তিনি বলিলেন, আমি ইহাই চাই যে, আমি কিছুই চাহিব না। সুতরাং এই ধরনের লোকেরা আল্লাহ পাকের কাছে আকাঙ্খা ও চাহিদা হইয়া হইয়া থাকে যে তাহাদের কোন ইচ্ছা নাই। কেননা তাহারা জানে যে, ইহাই বড় কেরামত এবং বড় নৈকট্য। অনেক সময় বিশেষ বিশেষ কেরামত প্রকাশ হইয়া থাকে কিন্তু অপ্রকাশ্যভাবে হইলেও ইহাতে নিজের পক্ষ হইতে সামান্য ব্যবস্থা গ্রহণ লুকায়িত থাকে। অথচ প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ কেরামত হইল ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করা এবং আল্লাহ পাকের নির্দেশের সামনে স্বীয় এখতিয়ার সোপর্দ করা। শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, দুইটি জিনিস সমস্ত কেরামতের মূল। তন্মধ্যে প্রথম কেরামত হইল ঈমান। যাহার দ্বারা একীন বৃদ্ধি পায় এবং দর্শন লাভ হয়।

দ্বিতীয় কেরামত হইল এমন আমল যাহাতে আনুগত্য থাকে। নিছক দাবী ও ধোকা থেকে বেঁচে থাকা হয়। যাহার উল্লিখিত কেরামতদ্বয় নসীব হইয়াছে ইহার পরও অন্য কোন কেরামত তালাশ করে সে ব্যক্তি ধোকায় পতিত মিথ্যুক অথবা তাহার ইলম ও আমলে ত্রুটি রহিয়াছে। এই ব্যক্তির অবস্থাকে একটি

উদাহরণের মাধ্যমে বুঝা যাইতে পারে যে, বাদশাহ খুশী হইয়া এক ব্যক্তিকে স্বীয় সভাসদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার সুযোগ প্রদান করিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তি ঘোড়ার খেদমতগার হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বাদশাহের সন্তুষ্টির পোশাক পরিত্যাগ করিল।

কেরামতের সাথে যদি বান্দার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর প্রতি বান্দার সন্তুষ্টি সম্পৃক্ত না হয় তাহা হইলে সে কেরামতওয়ালা হয়ত ধোকায় পতিত হইয়াছে অথবা সে অসম্পূর্ণ অথবা সে ধ্বংসের কবলে পতিত হইয়াছে। এখন ভালভাবে বুঝিয়া লও যে, কেরামতের কেরামত হওয়াটা আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহর সন্তুষ্টির আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহের মধ্যে একটি অপরিহার্য বিষয় হইল, নিজের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করা এবং আল্লাহর সামনে স্বীয় এখতিয়ার নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া।

হযরত বায়েযীদ (রহঃ) বলিয়াছেন যে, তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন যে, তিনি কোন ইচ্ছাই করিবেন না। তাহার এই বক্তব্যের উপর কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিল যে, ইচ্ছা না করার ইচ্ছাও তো ইচ্ছা? সুতরাং তিনি ইচ্ছা মুক্ত হইলেন কিভাবে? প্রকৃতপক্ষে তাহার এই বক্তব্যের উপর এই আপত্তি বে-ইলম লোকদের। কেননা বায়েযীদের (রহঃ) কথার অর্থ ইহা যে, তিনি কোন ইচ্ছা করিবেন না। বান্দাগণ কোন ইচ্ছা না করুক ইহা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। সুতরাং বায়েযীদের ইচ্ছা না করার ইচ্ছা আল্লাহ পাকের ইচ্ছার মোয়াফেক হইয়াছে।

মোটকথা, হযরত বায়েযীদ (রহঃ) সর্বপ্রকার ইচ্ছার অস্বীকার করেন নাই। বরং যে ইচ্ছা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির পরিপন্থী তাহা করিতে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলিয়াছেন, যতগুলি জিনিস শরীয়তের পছন্দনীয় এবং শরীয়ত কর্তৃক বিন্যস্ত এই সকল জিনিসে তোমার কোন এখতিয়ার বা ইচ্ছার স্থান নাই। এইগুলি শ্রবণ কর আর পালন করিতে থাক। আর এই পর্যায় ফিকহে রব্বানী আর ইলমে লুদনীর পর্যায়। ইলমে লুদনী আল্লাহ পাক থেকে অর্জিত হয়।

হযরত শায়খ (রহঃ) তাঁহার বক্তব্যে এই কথা বলিয়াছেন যে, যতগুলি জিনিস শরীয়তের পছন্দনীয় তাহা অবলম্বন করা আল্লাহর দাস হওয়ার মর্যাদা অর্জনের পরিপন্থী নয়। আর আল্লাহ পাকের দাসত্বের মর্যাদা লাভের ভিত্তি হইল এখতিয়ার ও ইচ্ছা পরিহার করা। আমরা এই জন্য উল্লেখ করিলাম যাহাতে কোন বিবেকবান ধোকা না খায় এবং ইহা বুঝিয়া না লয় যে, ওজিফা, তাসবীহ

এবং সুন্নতে মুয়াক্কাদা প্রভৃতির ইচ্ছা করার দ্বারা আল্লাহর দাসত্ব লাভের মর্যাদা হাতছাড়া হইয়া যায়। কেননা এই সবের ইচ্ছা করাও তো এক প্রকার এখতিয়ার।

তাহার এই ভুল ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন যে, যতগুলি জিনিস শরীয়তের পছন্দনীয় ও শরীয়ত কর্তৃক বিন্যস্ত ইহাদের কোন একটিও পরিহার করার এখতিয়ার নাই। এইগুলি তো পালন করিতেই হইবে। তোমাকে তো নিজের এখতিয়ার ও ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ ও তদীয় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দনীয় জিনিসও ব্যবস্থা পরিত্যাগ করার কথা বলা হয় নাই।

সুতরাং এই বর্ণনা হইতে হযরত বায়েযীদ (রহঃ)-এর ইচ্ছা না করার ইচ্ছা করার কারণ বুঝা যায়। তাহা হইল বান্দা ইচ্ছা না করিলে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট থাকেন। তাই এই ধরনের ইচ্ছার (অর্থাৎ ইচ্ছা না করার ইচ্ছা করা) কারণে বান্দা আল্লাহর অনুগত দাস হওয়ার পরিধি হইতে বাহির হইয়া পড়িবে না। আর বান্দা আল্লাহর দাস হইয়া থাকুক ইহা আল্লাহর চাহিদা।

সুতরাং বুঝা গেল যে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিবার রাস্তা হইল ইচ্ছা মিটাইয়া দেওয়া আর চাহিদা বর্জন করা। এমনকি শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, কোন ওলী ততক্ষণ খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না যতক্ষণ তাহার মধ্যে এখতিয়ার ও তদবীর (ব্যবস্থা অবলম্বন) অবশিষ্ট থাকে। আমি শুনিয়াছি যে, শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ) বলিয়াছেন, বান্দা খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার এই পৌঁছার আকাঙ্খাও পরিত্যক্ত না হয়। অবশ্য এখানে আকাঙ্খা পরিত্যক্ত হওয়ার কথা বলিয়া এমন আকাঙ্খা পরিত্যক্ত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে যাহার সাথে বান্দার আদব-কায়দা জড়িত। কেননা আকাঙ্খা পরিত্যক্ত হয় দুই কারণে। কখনও কখনও কোন কিছুর আকাঙ্খা করাকে আদবের পরিপন্থী বলিয়া মনে করা হয়। তাই আদব রক্ষার্থে আকাঙ্খা করা পরিহার করা হয়। আবার কখনও কখনও আকাঙ্খা পরিহার করা হয় মন উঠিয়া যাওয়ার কারণে, অন্তর না লাগার কারণে। সুতরাং আল্লাহর ওলীগণ থেকে যে আকাঙ্খা পরিত্যক্ত হয় উহার সম্পর্ক প্রথম প্রকার অর্থাৎ আদবের সাথে।

অথবা আকাঙ্খা এই কারণেও পরিত্যক্ত হয় যে, বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভের পর প্রত্যক্ষ করিতে পায় যে, সে ইহার যোগ্য নয় তখন সে নিজেকে এই পর্যায় হইতে অনেক নীচ পর্যায়ের বলিয়া মনে করিতে থাকে। এইজন্য মিলনের

আকাঙ্খা তাহার থেকে দূর হইয়া যায়। সুতরাং যদি নিজকে আলোকিত করিতে চাও; তাহা হইলে নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন করা পরিহার কর। আল্লাহর ওলীদের পন্থায় পথ চল। আর তাহারা ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করার পন্থায় পথ চলিয়াছিলেন। সুতরাং তোমরাও তাহা লাভ করিতে পারিবে। কবি বলেন-

چلو تم راہ پر انکی طریقہ دل سے لوان کا

پهنچ جاؤ گے منزل پر یہی وادی کی جانب

তোমরা তাহাদের পথে পথ চল। তাহাদের তরীকা অন্তর দিয়া গ্রহণ কর। তাহা হইলে তোমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া যাইবে। এই উপত্যকার দিকে।।

এই বিষয়ের উপর আমি কৈশোরে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলাম। আমার কোন এক বন্ধুকে উদ্দেশ্য করিয়া ইহা রচনা করা হইয়াছিল। (কবিতাটির অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল)

☆ হে বন্ধু! কাফেলা তো তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছে। আমরা তো এখানে বসিয়া রহিয়াছি। এখন তোমরা কি করিবে?

☆ আমরা পিছনে পড়িয়া থাকিব ইহাতে তোমরা সম্মত আছ কি? হে এলাহি! আপনার সাথে আমার প্রবৃত্তির যে বিরোধিতা হয়েছে তাহা দূরীভূত করিয়া দিন।

☆ বিশ্ব নিখিলের জবান উচ্চস্বরে ঘোষনা করিতেছে যে, যত সৃষ্টি রহিয়াছে সব ধ্বংস হইয়া যাইবে।

☆ নাজাতের পথ ঐ ব্যক্তিরই দৃষ্টিগোচর হইবে যে লোভ-লালসা হইতে বাঁচিয়া আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকলকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

☆ যে মাখলুকের আগে আল্লাহকে দেখিবে সে সৃষ্টিকর্তার মোকাবিলায় সৃষ্টিকে পরিহার করিবে।

☆ যে এই রাস্তায় চলে নূর তাহার দৃষ্টিগোচর হয়। যাহার রূপ এই দিকে সমস্ত ভেদ তাহার কাছে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

☆ উঠ, দেখ সমস্ত মাখলুক তাঁহার নূরে পরিবেষ্টিত এবং প্রভাত নিকটবর্তী। তিনিই ইহা উদয় করিয়াছেন।

☆ তাঁহার দাস হইয়া তুমি তাঁহার নির্দেশের প্রতি অনুগত হইয়া যাও। ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার কর। ইহাতে কোন ফায়দা নাই।

☆ ব্যবস্থা অবলম্বন কি করিবে? ফয়সালাদাতা তো অন্য কেহ। বরং ইহা

অবলম্বনের দ্বারা আল্লাহর হুকুমের সাথে প্রকাশ্য ঝগড়া করিবে।

☆ নিজের ইচ্ছা ও চাহিদা মিটাইয়া দাও। ভালভাবে শুনিয়া লও যে, ইহা বড় উদ্দেশ্য।

☆ পূর্ববর্তী লোকজন এইভাবেই চলিয়াছিল। ফলে তাহারা উদ্দেশ্য অর্জন করিয়াছিল। বৃদ্ধ হউক বা যুবক হউক এইভাবেই চলিবে। (অর্থাৎ চলা উচিত)

আল্লাহ পাকের এমন এমন বান্দাও রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ পাকের শিক্ষা ও আদব লাভ করিয়া নিজেদের ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের নিজেদের জন্য নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন নাই। আল্লাহ পাকের শিক্ষা ও আদব প্রদানের নূর তাহাদের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার পরিচয় ও রহস্য তাহাদের পাহাড়সম এখতিয়ার চুরচুর করিয়া দিয়াছে। সুতরাং তাহার প্রতি রাজী থাকার পর্যায়ে তাহাদের স্থান হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা এই পর্যায়ের স্বাদও পাইয়াছে। অতঃপর তাহারা এই ভয়ে প্রার্থনা করা শুরু করিয়াছে যে, যাহাতে তাহারা রাজী থাকার স্বাদের মধ্যে লিপ্ত হইয়া ইহার দিকে ঝুঁকিয়া না পড়ে।

শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, আমি প্রথম প্রথম নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ অনুসরণ করিয়াছিলাম। আমি কি কি নেক কাজ করিব ইহার পরিকল্পনা করিতাম। আর ইহার জন্য কি কি পথ ও মাধ্যম প্রয়োজন হইবে উহা প্রস্তুত করিবার চিন্তা ভাবনা করিতাম। কোন কোন সময় মনে মনে বলিতাম যে, ময়দান এবং জঙ্গলে গিয়া পড়িয়া থাকিব। আবার কোন কোন সময় ভাবিতাম যে, শহর এবং জনপদে গিয়া পড়িয়া থাকিব। কেননা সেখানে ওলী এবং নেককারদের সংশ্রব পাওয়া যাইবে। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি এক ওলীর প্রশংসা করিল। তিনি পশ্চিম দেশের কোন এক পাহাড়ে অবস্থান করিতেছেন। আমি সে পাহাড়ে আরোহন করিলাম। রাত্রে তাহার কাছে পৌঁছিলাম। আর তখনই তাহার খেদমতে হাযির হওয়া সঙ্গত মনে করিলাম। আমি শুনিতে পাইলাম যে, তিনি দোয়া করিতেছেন, হে এলাহি। অনেক মানুষ আপনার কাছে দোয়া করে আপনি যেন মাখলুককে তাহাদের অধীন করিয়া দেন। আর আপনি তাহাদিগকে ইহা দান করেন। তাহারা ইহার উপর রাজী হইয়া যায়। হে এলাহী! আপনার কাছে আমার প্রার্থনা হইল এই যে, সমস্ত মাখলুক যেন আমার প্রতিকূলে হইয়া যায় আর আপনি ব্যতীত আমার কোন আশ্রয় না থাকে। শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, আমি মনকে বলিলাম, হে

মন! চিন্তা করিয়া দেখ যে এই ওলী কোন সমুদ্র দিয়া চলিতেছেন। অতঃপর আমি ঐ রাত্রে তাহার সাথে সাক্ষাৎ না করিয়া তথায়ই অবস্থান করিলাম। প্রত্যুষে তাহার সাথে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে সালাম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম হে জনাব! কি অবস্থায় আছেন। তিনি জবাব দিলেন তুমি নিজের জন্য নিজে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাক এবং নিজে এখতিয়ার খাটাইয়া কাজ কর এই জন্য তোমার যেমন অস্থিরতার আপত্তি রহিয়াছে তদ্রুপ আল্লাহর কাছে নিজকে সোপর্দ করার এবং তাহার প্রতি রাজী থাকার অস্থিরতার আপত্তি আমারও রহিয়াছে।

আমি বলিলাম, হযরত! নিজের এখতিয়ারে কোন কিছু করার এবং নিজের জন্য নিজের ব্যবস্থা অবলম্বন করার যে কি মজা তাহা আমি পাইয়াছি এবং এখনও পাইতেছি। কিন্তু আপনি তো আল্লাহর প্রতি নিজকে সোপর্দ করিয়াছেন এবং তাহার প্রতি রাজী আছেন ইহাতে আপনার অস্থিরতার আপত্তি কেন হইবে? আমার তাহা বুঝে আসে না।

তিনি বলিলেন, আমার এইরূপ বলার কারণ হইল যে, আমার ভয় হইতেছে না জানি আমি এই দুইটি জিনিসের মজায় পতিত হইয়া আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়া পড়ি।

অতঃপর আমি বলিলাম, হযরত! গতরাত্রে আমি শুনিয়াছি যে, আপনি দোয়া করিতেছেন হে এলাহী! অনেক লোক আপনার কাছে দোয়া করে আপনি যেন মাখলুক তাহাদের অধীন করিয়া দেন। আর আপনি তাহাদিগকে তাহা দান করেন। ফলে তাহারা আপনার প্রতি রাজী হইয়া যায়। হে এলাহী! আপনার কাছে আমার আবেদন হইল এই যে, সমস্ত মাখলুক যেন আমার প্রতিকূলে থাকে। আর একমাত্র আপনিই আমার আশ্রয় থাকেন। ইহার কারণ কি? তিনি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, হে আমার বৎস। হে আল্লাহ! আপনি স্বীয় মাখলুককে আমার অধীন করিয়া দিন। ইহা বলা অপেক্ষা হে আল্লাহ! আপনি আমার হইয়া যান। ইহা বলা উত্তম। খুব চিন্তা করিয়া দেখ যে, সমস্ত মাখলুক যদিও তোমার হইয়া যায় ইহারা তোমার কোন উপকার করিতে পারিবে না। সুতরাং মাখলুকের সাহায্য গ্রহণ করা কত কম হিম্মতের কথা।

হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্রের পানিতে ডুবার ঘটনা

হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র কেনান পানিতে ডুবিয়া ধ্বংস হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে সে নিজের গৃহীত ব্যবস্থার আশ্রয় লইয়াছিল। আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ) এবং তাহার নৌকার লোকদের জন্য যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কেনান উহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। হযরত নূহ (আঃ) তাহাকে বলিয়াছিলেন বৎস! তুমিও আমাদের সাথে নৌকায় আরোহন কর। কাফেরদের সাথে যাইও না। সে জবাব দিল যে, আমি কোন এক পাহাড়ে উঠিয়া পড়িব। আর সে পাহাড় আমাকে রক্ষা করিবে। তিনি বলিলেন, আল্লাহর আযাব হইতে আজ কেহই বাঁচিতে পারিবে না। তবে যাহার প্রতি তাঁহার মেহেরবানী হয় একমাত্র সে বাঁচিতে পারিবে। প্রকৃতপক্ষে সে নিজের বিবেকের পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছিল। বাহ্যিকভাবে সে যে পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছিল প্রকৃতপক্ষে তাহা তাহার বিবেকের পাহাড়ের বাহ্যিক রূপ। অতঃপর তাহার শোচনীয় পরিনতির কথা কুরআনে বর্ণনা করা হইয়াছে।

وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ *

"তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটি তরঙ্গ প্রতিবন্ধক হইয়া পড়িল। ফলে সে নিমজ্জিত হইয়া গেল।" বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, সে নিমজ্জিত হইয়াছে বন্যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নিমজ্জিত হইয়াছে বঞ্চনায়।

সুতরাং (আল্লাহ পাক যেন বলিতেছেন) হে বান্দা সকল! এই ঘটনা থেকে সামান্য হইলেও শিক্ষা গ্রহণ কর। তাকদীরের তরঙ্গ যখন তোমাকে থাপ্পর মারিবে তখন নিজের বিবেকের বাতিল পাহাড়ের দিকে চলিও না। ইহার ফলে বিচ্ছেদের সাগরে পতিত হইবে। সুতরাং স্বীয় বিবেকের আশ্রয় লইয়া বিচ্ছেদের সাগরে পতিত হইও না। বরং এই সময় তাওয়াক্কুলের নৌকায় আরোহন করিও। জানিয়া রাখ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আশ্রয় লইয়াছে সে সোজা ও সরল পথে উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে আল্লাহ তাহার জন্য যথেষ্ঠ। সুতরাং যখন এই রূপ করিবে তখন নাজাতের নৌকা তোমাকে লইয়া নিরাপত্তার জুদী পাহাড়ে গিয়া থামিবে। অতঃপর তুমি এই নিরাপদ পাহাড়ে অবতরণ করিবে নিরাপদ নৈকট্য অর্জনের সাথে আর মিলনের বরকত হাসিলের মাধ্যমে। আর এই বরকত নাযিল হইবে তোমার উপর ও তোমার সাথীদের উপর। বিষয়টি খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও; অসতর্ক হইও না। স্বীয় প্রভুর ইবাদত কর। মূর্খ থাকিও না। সুতরাং তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, নিজের জন্য নিজের ব্যবস্থা অবলম্বন পরিত্যাগকরন এবং এখতিয়ার বর্জন খুব জরুরী জিনিস। একীনওয়ালা ইহা অপরিহার্য বিষয় বলিয়া মনে করে। আর ইবাদতকারীরা ইহা অনুসন্ধান করিতে থাকে। আহলে মারেফাত ইহার মাধ্যমে নিজকে সজ্জিত করিয়া তোলে। তাই ইহা উচ্চমর্যাদা দানকারী জিনিস।

আমি কাবা ঘরের পার্শ্বেই এক আরেফ (আল্লাহর পরিচয়প্রাপ্ত) ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোন দিকে প্রত্যাবর্তন করিবেন? তিনি বলিলেন, আমার ইচ্ছা আমার কদম অতিক্রম করিতে পারে না। (অর্থাৎ কোন কাজ করার পূর্বে আমার ইচ্ছা থাকে না। যখন যাহা হওয়ার আল্লাহর ইচ্ছায় হইতেছে)

কোন এক বুযুর্গ বলেন, যদি জান্নাতবাসীরা জান্নাতে চলিয়া যায় আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলিয়া যায় শুধু আমি একাকী বসিয়া থাকি, তখন জান্নাত জাহান্নামের কোথায় আমার স্থান হইবে। এই পার্থক্য আমার থাকিবে না। সব আমার জন্য বরাবর।

সুতরাং এমন অবস্থা ঐ ব্যক্তির মধ্যেই হইতে পারে যাহার সমস্ত এখতিয়ার ও ইচ্ছা মিটিয়া গিয়াছে। আর আল্লাহ পাকের ইচ্ছার সামনে তাহার কোন ইচ্ছা না থাকে। আদিকালের কোন এক বুযুর্গ বলিয়াছেন, আমার ইচ্ছা আল্লাহর নির্ধারিত তকদীরের পর্যায়ে রহিয়াছে।[১] আবু হাফছ হাদ্দাদ (রঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক আমাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমি ইহা পছন্দ করিয়া আসিতেছি। আর আমাকে যে অবস্থার দিকে লইয়া যাইতেছেন আমি ইহার জন্য নাখোশ নহি।

এক বুযুর্গ আমাকে বলিয়াছেন, আমি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত চাহিতেছি আমার যেন কোন খাহেশ (চাহিদা) না থাকে। যাহাতে এমন জিনিস যাহার চাহিদা আমার অন্তরে উদ্ভব হয় তাহা পরিহার করিতে পারি। কেননা চাহিদা না থাকিলেই এমন জিনিস পরিহার করা সম্ভব হইবে। কিন্তু তলাইয়া দেখিলাম যে, আমার মনে কোন জিনিসের চাহিদাই পাওয়া যায় না। যাহা পরিহার করিয়া চাহিদা না করার চাহিদা পূরণ করিতে পারি।

ইহা এমন এক ধরণের অন্তর আল্লাহ পাক স্বয়ং যাহার সাহায্য সহযোগীতা করিতেছেন এবং ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেছেন। আল্লাহ পাক বলেন-

إِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ *

আমার বিশেষ বান্দাদের উপর তোমার কোন জোরজবরদস্তি চলিবে না। ইহার কারণ আল্লাহর খাঁটি বান্দা হিসাবে থাকার ক্ষেত্রে অটল থাকা, আল্লাহকে প্রভু মানিয়া থাকার ক্ষেত্রে সুদৃঢ় থাকা। তাঁহার সামনে বান্দাকে কোন এখতিয়ার

১। অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাহার তকদীরে যাহা রাখিয়াছেন তাহা অবশ্যই হইবে। আমার ইচ্ছা ইহারই মোতাবেক।

থাকিতে, কোন গোনাহ করিতে এবং কোন কলুষতায় জড়াইয়া পড়িতে দেয় না। আল্লাহ পাক বলেন, যাহারা স্বীয় প্রভুর প্রতি বিশ্বাস করে এবং তাহার প্রতি ভরসা করে তাহাদের উপর শয়তানের কোন জোর চলে না। সুতরাং যে সকল অন্তরে শয়তানের নিয়ন্ত্রণ চলে না উহার মধ্যে নিজের জন্য নিজের ব্যবস্থা অবলম্বনের কুমন্ত্রনা কোথায় থেকে আসিবে এবং তাহার দ্বারা এই অন্তর কিভাবে ময়লাযুক্ত হইবে।

অত্র আয়াতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, যাহারা ঈমান ও তাওয়াক্কুল ঠিক করিবে তাহাদের উপর শয়তানের নিয়ন্ত্রণ চলিবে না। কেননা শয়তান দুইভাবে আসে। হয়তবা সে আকিদার (অর্থাৎ বিশ্বাসগত ক্ষেত্রে সংশয় ও সন্দেহের সৃষ্টি করিবে। অথবা বান্দাকে মাখলুকের দিকে ঝুঁকাইয়া মাখলুকের উপর তাহাকে নির্ভরশীল করিয়া তুলিবে। সন্দেহ থেকে মুক্তি লাভ হইবে ঈমানের দ্বারা আর মাখলুকের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া থেকে মুক্তি লাভ হইবে তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে।

সতর্কতা ঃ কখনও কখনও ঈমানদারকে ব্যবস্থা অবলম্বনের বিপদাপদ ও ঝাঞ্ঝাট পাইয়া বসে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাহা ঈমানদারের মধ্যে বহাল থাকিতে দেন না। যেমন আল্লাহ পাক বলিতেছেন, আল্লাহ পাক ঈমানদারদের অভিভাবক। তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে লইয়া যান। অর্থাৎ "আল্লাহ পাক ঈমানদারদিগকে ব্যবস্থা অবলম্বন করার অন্ধকার হইতে সমর্পনের আলোর দিকে লইয়া যান।" অসত্যের অস্থিরতার উপর সত্যের সুদৃঢ়তাকে বিজয়ী করেন। সুতরাং তিনি অসত্যের স্তম্ভসমূহকে নড়বড় করিয়া দেন। ইহার ইমারত ধ্বংস করিয়া দেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেন, বরং আমি মিথ্যার উপর সত্যকে ছুড়িয়া মারি। আর সত্য মিথ্যার মস্তিষ্ক ভাঙ্গিয়া ফেলে। ফলে বাতিল দূরীভূত হইতে থাকে। যদিও ঈমানদারের মধ্যে অস্থিরতা এবং নিজের জন্য নিজের ব্যবস্থা অবলম্বনের বিপদাপদ আসিয়া থাকে। কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। বরং আসিবার পরই আবার দূরীভূত হইয়া যায়। কেননা ঈমানের নূর তাহাদের অন্তরে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। ইহার নূর তাহাদের অবাধ্য প্রবৃত্তিকে দমাইয়া দিয়াছে। ইহার নূর তাহাদের অবাধ্য প্রবৃত্তিকে দমাইয়া দিয়াছে, ইহার জ্যোতি তাহাদের অন্তর ভরপুর করিয়া দিয়াছে। ইহার প্রভা তাহাদের বক্ষ খুলিয়া দিয়াছে। বরং কখনও কখনও তাহাদের ঈমানী সজাগতায় তন্দ্রার ন্যায় অবস্থা সংযুক্ত হয়। এই অবস্থায় ব্যবস্থা অবলম্বনের কাল্পনিক আকৃতির জন্ম লাভ করার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অতঃপর যখন সেই তন্দ্রা দূরীভূত হইয়া ঈমানী সজাগতা শক্তিশালী হইয়া উঠে তখন তাহার ব্যবস্থা অবলম্বনের

কাল্পনিক ছবি দূরীভূত হইয়া যায়।

আল্লাহ পাক বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوا اِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ × مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ *

নিশ্চয়ই যাহারা আল্লাহকে ভয় করে যখন কোন শয়তানী খেয়াল তাহাদিগকে স্পর্শ করে তৎক্ষণাৎ তাহারা হুশিয়ার হইয়া উঠে। সুতরাং তখনই তাহারা দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া যায়।

অত্র আয়াতে কয়েকটি ফায়দার কথা রহিয়াছে

প্রথম ফায়দা ঃ اذا مسهم আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, মৌলিকভাবে তাহারা শয়তানী কুমন্ত্রনা হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবে যদি কখনও এইরূপ হয় (অর্থাৎ শয়তানী খেয়াল স্পর্শ করে। তাহা ঘটনাচক্রে হয়। সুতরাং তাহাদের অন্তরে যে ঈমান আমানত রাখা হইয়াছে অত্র আয়াতে তাহা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কেননা যদি তাহারা সর্বদা শয়তানের কুমন্ত্রনায় গ্রেপ্তার থাকে তাহা হইলে আল্লাহ পাক এইরূপ বলিতেন না। যখন তাহাদিগকে শয়তানী খেয়াল স্পর্শ করে কারণ তাহাদের এইরূপ প্রশংসা করার দ্বারা বুঝা গেল যে, তাহাদের মধ্যে প্রথমে এই ধারণা ছিল না পরে এই ধারণা আসিয়া তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে।

দ্বিতীয় ফায়দা ঃ اذا مسهم আয়াতাংশে مسهم বলা হইয়াছে। امسكهم বা امسك বা اخذهم বলা হয় নাই। مس (মাস্) শব্দের অর্থ স্পর্শ করা। আর اخذ শব্দের অর্থ ধরা। অধিকন্তু স্পর্শ করার অর্থে স্থায়িত্ব নাই। ইহা দীর্ঘায়িত হয় না। সুতাং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাহাদের অন্তরে শয়তানী খেয়াল জমা হয় না। বরং এমনিতেই সামান্য পরিমাণ স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়। কাফেরদের ন্যায় তাহাদের অন্তরে এই বদখেয়াল দীর্ঘায়িত হয় না। কাফের ও মুসলমানদের এই ক্ষেত্রে পার্থক্য হওয়ার কারণ শয়তান কাফেরের উপর প্রাধাণ্য বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু মুসলমানদের অন্তরের পাহারাদার বিবেক যখন সমান্য তন্দ্রায় আসে তখন শয়তান তাহাদের অন্তর থেকে কোন কিছু লইয়া পলায়ন করিতে থাকে। অতঃপর বিবেক যখন জাগ্রত হইয়া উঠে থাকে অন্তরের ক্ষমা প্রার্থনা, লজ্জাবোধ এবং আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষীতা নামক সেনাবাহিনী মাথাচাড়া দিয়া উঠে তখন শয়তান যাহা লইয়া পলায়ন করিতে থাকে তাহা সম্পূর্ণ ফিরাইয়া আনে এবং সে যাহা লুট করিয়া লয় তাহা উদ্ধার করিয়া আনে।

×। طيف শব্দ যোগে আয়াত গ্রন্থকারের কেরাত মোতাবেক বর্ণিত।

তৃতীয় ফায়দা ঃ طيف শব্দ উল্লেখ করিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, সর্বদা যে অন্তর সজাগ থাকে উহার মধ্যে শয়তান আসিতে পারে না। কেননা শয়তানী খেয়াল অন্তরে তখনই আসে যখন অন্তর গাফেল হইয়া পড়ে। সুতরাং সে ঘুমায় না শয়তানী খেয়াল তাহার কাছেও আসিতে পারে না।

চতুর্থ ফায়দা ঃ আল্লাহ পাক অত্র আয়াতে طيف শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। مسهم وارد (অর্থাৎ তাহাদিগকে অবতরণকারী কোন জিনিস স্পর্শ করিয়াছে) বা সমার্থক কোন শব্দ বলেন নাই। প্রকৃতপক্ষে طيف শব্দের অর্থ স্বপ্নে দৃষ্ট খেয়াল বা ধারণা। সুতরাং ইহার কোন স্থায়িত্ব নাই। বাস্তবক্ষেত্রে ইহা অস্তিত্বহীন। ইহা একটি কল্পনা মাত্র। আল্লাহ পাক এই শব্দটি ব্যবহার করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন যে এই ধরণের শয়তানী খেয়ালের দ্বারা তাকওয়াওয়ালা লোকদের কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা শয়তান তাহাদিগকে যাহা দেখাইতেছে তাহা স্বপ্নে দৃষ্ট কাল্পনিক জিনিসের সাথে তুলনা করা যায়। আর স্বপ্নে যাহা দেখা যায় ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর উহার কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পঞ্চম ফায়দা ঃ অত্র আয়াতে تذكروا শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ذكروا শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই। এইরূপ করার পিছনে হেকমত এই যে, শুধু যিকর গাফলতি দূর করিতে পারে না যখন অন্তর এইদিকে মনোনিবেশ না করে। অবশ্য 'তাযাক্কুর' (উপদেশ গ্রহণ করা) এবং 'ইতিবার' (শিক্ষা গ্রহণ করা) গাফলতি দূর করিতে পারে যদিও যিক্‌র না পাওয়া যায়। কেননা যিক্‌র হয় জিহবার দ্বারা আর 'তাযাক্কুর' বা উপদেশ গ্রহণ হয় অন্তরের দ্বারা। শয়তানী খেয়াল আসে অন্তরের মধ্যে, জিহবার মধ্যে নয়। সুতরাং ইহা দূরীকারক ও অন্তরে অবতরণ করা উচিত। যাহাতে ইহার প্রভাবে শয়তানী খেয়াল দূরীভূত হয়। আর ইহা তাযাক্কুরের দ্বারা সম্ভব; যিকিরের দ্বারা নয়।

ষষ্ঠ ফায়দা ঃ অত্র আয়াতে تذكر (তাযাক্কুর) শব্দের কর্ম উহ্য রাখা হইয়াছে। এমন বলেন নাই تذكروا الجنة অথবা تذكروا النار অথবা تذكروا العقوبة অথবা এই ধরণের কোন কথা বলেন নাই। এই শব্দের কর্ম উহ্য করিয়া দেওয়ার মধ্যে বড় ফায়দা রহিয়াছে। তাহা এই যে, তাযাক্কুর একীনওয়ালাদের অন্তর থেকে শয়তানী খেয়াল মিটাইয়া দেয়। সমস্ত নবী, রাসূল, আওলিয়া, সিদ্দীক, নেককার এবং সকল মুসলমান তাকওয়াওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য সকলের তাকওয়া এক পর্যায়ের নহে। প্রত্যেকের তাকওয়া তাহার অবস্থা ও স্তর মোতাবেক হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে প্রত্যেকের তাযাক্কুর (উপদেশ গ্রহণ করা)

তাহার তাকওয়ার স্তর উপযোগী হইয়া থাকে। সুতরাং সকলের তাকওয়া এক নয় আবার সকলের তাযাক্কুরও এক নয়। সুতরাং যদি কোন এক বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীর তাযাক্কুরের কথা উল্লেখ করা হইত তাহা হইলে শুধু এই ব্যক্তি বা শ্রেণীই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইত। অন্যান্যরা বাদ পড়িয়া যাইত। উদাহরণ স্বরূপ- যদি এমন বলা হইত

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا الْعُقُوبَةَ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ *

তাহা হইলে যাহারা সাওয়াবের মাধ্যমে নসিহত হাসিল করে তাহারা বাদ পড়িয়া যাইত। আর যদি এইভাবে বলিত تذكوا سائق الاحسان অর্থাৎ তাহারা প্রথম ইহসান থেকে নসিহত কবুল করে তাহা হইলে যাহারা পরবর্তী এহসান থেকে নসিহত কবুল করে তাহারা বাদ পড়িয়া যাইত। অনুরূপভাবে যে কোন কর্মকে উল্লেখ করিত অনুল্লেখিত কর্ম বাদ পড়িয়া যাইত। আল্লাহ পাক কোন বিশেষ কর্ম উল্লেখ না করার ফলে নসিহত কবুল করার সমস্ত স্তর আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সপ্তম ফায়দা ঃ আল্লাহ পাক অত্র আয়াতে تذكروا فاذا هم مبصرون বলিয়াছেন। কিন্তু تذكروا فابصروا বলেন নাই বা تذكوا وابصروا বলেন নাই বা تذكروا ثم ابصروا বলেন নাই।

অত্র আয়াতে উদ্দেশ্য এই কথা বর্ণনা করা যে, তাহারা দৃষ্টিসম্পন্ন হয় বা তাহারা মনোনিবিষ্ট হয় তাহাদের হুশিয়ার হওয়ার কারণে। অর্থাৎ তাহাদের হুশিয়ার হওয়ার ফল স্বরূপ তাহারা দৃষ্টিসম্পন্ন বা মনোনির্বিষ্ট হইয়াছে। আর আরবী ভাষায় 'ফা' বর্ণটি ব্যবহার হয় সবব বা কারণ বর্ণনা করার জন্য। তাই এখানে 'ওয়াও' বা 'ছুম্মা' ব্যবহার করা হয় নাই। কারণ 'ওয়াও' বা ছুম্মা শব্দ আরবী ভাষায় কারণ বর্ণনার অর্থ প্রকাশ করে না। ছুম্মা ব্যবহার না করার দ্বিতীয় কারণ এই যে, ছুম্মা শব্দটি ব্যবহার করা উদ্দেশ্য পরিপন্থী হয়। কেননা আরবী ভাষায় ছুম্মা শব্দটি ব্যবহৃত হয় বিলম্ব বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ ছুম্মা শব্দ ব্যবহার করিলে ইহার অর্থ হইবে ছুম্মা শব্দের পূর্বে উল্লিখিত বিষয়টির অনেক পরে ছুম্মা শব্দের পরে উল্লিখিত বিষয়টি হইয়াছে। কিন্তু অত্র আয়াতে আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য হইল এই কথা বুঝানো যে, তাহাদের দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া তাহাদের হুশিয়ার হওয়া হইতে বিলম্ব হয় নাই। বরং তাহারা হুশিয়ার হওয়ার সাথে সাথেই তাহারা দৃষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ মনোনিবিষ্ট হয়।

যদিও 'ফা' শব্দ ব্যবহার করা একদিক দিয়া যথোপযুক্ত হইয়াছে। তবুও শুধু 'ফা' ব্যবহার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই কেননা শুধু 'ফা' ব্যবহার করিলেও উদ্দেশ্য

হাসিল হয় না বরং উদ্দেশ্য পরিপন্থী হয়। কেননা 'ফা শব্দ ব্যবহার করা হয় কারণ বুঝানোর সাথে সাথে আগে পিছের অর্থ বুঝানের জন্যও। আর অত্র আয়াতে ইহা উদ্দেশ্য নহে যে, তাহারা হুশিয়ার হওয়ার পরে তাহারা দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছে। এই জন্য 'ফা' শব্দ ব্যবহার করিয়া সাথে সাথে اذا শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। বলিয়াছেন, فاذا هم مبصرون যেন তিনি তাহাদের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তাহারা সর্বদাই দৃষ্টি সম্পন্ন থাকার গুণে গুণান্বিত থাকে। ইহাতে আল্লাহ পাক তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। তাহাদের প্রতি তাহার এহসানের প্রাচুর্যতার কথা প্রকাশ করিতেছেন। উদাহারণ স্বরূপ যেমন একজন বলিল, تذكر زيد المسئلة فاذا هى صحيحة (যায়দের মাসআলাটি স্মরণ হইয়াছে তখন সে তাহা বিশুদ্ধ পাইয়াছে।) অত্র উদাহরণে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে এই কথা স্পষ্ট যে, সে মাসআলাটি বিশুদ্ধ পাওয়ার পূর্বেও ইহা বিশুদ্ধ ছিল। আর এখনও ইহা বিশুদ্ধ পাইয়াছে। আয়াতের অর্থও ইহাই। তাকওয়াওয়ালারাও প্রথম থেকেই দৃষ্টি সম্পন্ন। কিন্তু নফসের মধ্যে শয়তানি খেয়াল আসার পর তাহার অর্ন্তদৃষ্টি লুকায়িত হইয়া পড়িয়াছে। অতঃপর যখন তাহাদের গাফলতির মেঘ দূরীভূত হয় তখন তাহাদের অর্ন্তদৃষ্টি চমকিয়া উঠে।

অষ্টম ফায়দা ঃ অত্র আয়াতে এবং অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত যতগুলি আয়াত রহিয়াছে তাহাতে তাকওয়াওয়ালাদের প্রতি খুব প্রশস্ততা দেখানো হইয়াছে। ঈমানদারদের প্রতি অনেক মেহেরবানী প্রদর্শন করা হইয়াছে। কেননা যদি আয়াতটি এইভাবে বলা হইত যে,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا لَا يَمَسُّهُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ *

অর্থাৎ তাকওয়াওয়ালাদের কখনও শয়তানী খেয়াল স্পর্শ করিতে পারে না।

তাহা হইলে নিষ্পাপ ব্যতীত অন্যান্য সকলে বাদ পড়িয়া যাইত। নবীগণ ও ফিরিশতাগণ নিষ্পাপ। সুতরাং নবীগণ ও ফিরিশতাগণ ব্যতীত অন্যান্য সকলেই আল্লাহ পাকের রহমতের পরিধি হইতে বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু এইরূপ না বলিয়া তিনি নিজের রহমতের পরিধিকে প্রশস্ত করিতে চাহিলেন। তাই তিনি বলিলেন,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ *

যাহাতে তুমি বুঝিতে পার যে, তাহাদের মধ্যে শয়তানী খেয়ালের আগমন তাহাদিগকে তাকওয়ার দায়রা থেকে এবং তাহাদের উপর এই নামজারী হওয়া থেকে বাহির করিয়া দেয় না। কেননা তাহারা সাথে সাথে হুশিয়ার হইয়া আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে।

এই আয়াতের ন্যায় অন্যান্য কয়েকটি আয়াত রহিয়াছে যাহাতে আশা করার ক্ষেত্রে বান্দাদের ব্যপকতার বর্ণনা রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ *

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তাওবাকারীদিগকে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদিগকে ভালবাসেন। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক এইরূপ বলেন নাই-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ لَا يُذْنِبُوْنَ *

যাহারা গোনাহ্ করে না আল্লাহ পাক তাহাদিগকে ভালবাসেন। কেননা যদি এইরূপ বলিতেন তাহা হইলে সামান্য কতক লোক মাত্র তাঁহার ভালবাসার অন্তর্ভুক্ত হইত। আর অধিকাংশ লোক বাদ পড়িয়া যাইত। অধিকন্তু আল্লাহ পাক বান্দাদের সৃষ্টি করার সময় তাহাদের দেহ গঠনে যে দুর্বলতা ও অসতর্কতা রাখিয়াছেন সে সম্পর্কে তিনি কুরআনে পাকে ঘোষণা দিয়াছেন

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا *

আল্লাহ পাক তোমাদের বোঝা হালকা করিতে চাহিতেছেন এবং মানুষকে খুব দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। কোন কোন আলেম এই আয়াতের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে ইহার অর্থ কামভাবের উত্তেজনা যখন মানুষের উপর প্রাধান্য পাইয়া যায় তখন সে নিজের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে না। অন্য এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন-

هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض و اذا انتم اجنة *

আল্লাহ পাক তোমাদের সম্পর্কে ভালভাবে জানেন, যখন তিনি তোমাদিগকে যমীন থেকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যখন তোমরা মায়ের উদরে কচি শিশু ছিলে।

এই সব আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, মানুষের উপর গোনাহ প্রাধান্য পাইয়া থাকে। আর আল্লাহ পাকও তাহাদের এই অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। তাই আল্লাহ পাক তাহাদের জন্য তাওবার দরজা প্রশস্ত করিয়া দিলেন। তাহাদের সামনে তাওবার রাস্তা দেখাইলেন এবং তাওবা করার দিকে তাহাদিগকে আহবান করিলেন। এমনকি প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন যে, তাওবা কর কবুল করিব। আমার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, আমি তোমার দিকে মনোনিবেশ করিব। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন-

كل ابن ادم خطاؤون خير الخطائين التوابين *

"প্রত্যেকটি মানুষ অপরাধী। কিন্তু উত্তম অপরাধী হইল তাওবাকারী।"

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লিখিত উক্তির মাধ্যমে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, অপরাধ তোমার অস্তিত্বের অপরিহার্য অঙ্গ। বরং অপরাধই তোমার অস্তিত্ব। অন্য একস্থানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন-

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ *

"তাহারা এমন লোক যখন তাহারা কোন অশ্লীল কাজ করিয়া বসে অথবা নিজের উপর জুলুম করে আর তখনই আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের অপরাধের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কে আছেন যিনি গোনাহ মাফ করিতে পারেন এবং তাহারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর হঠকারিতা করে না। এই অবস্থায় যে তাহারা জানে। অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক এইরূপ বলেন নাই যে الذين لا يفعلون الفاحشة তাহারা কোন গোনাহই করে নাই। অন্য একস্থানে বলিয়াছেন- و اذا ما غضبواهم يغفرون এবং যখন তাহারা গোস্বা হয় তখন মাফ করিয়া দেয়। এমন বলেন নাই যে, তাহারা গোস্বাই হয় না।

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন- و الكاظمين الغيظ "গোস্বা হজম করনেওয়ালা" এমন বলেন নাই যে, তাহাদের গোস্বাই হয় না। এই সব আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, বনী আদম অপরাধী হয়। অপরাধী হওয়া কোন অসম্ভব বিষয় নয়। সুতরাং তাহাদের জন্য তাওবার দরজা প্রশস্ত করা হইয়াছে। এখানে খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও যে, তোমার প্রতি আল্লাহ পাকের মেহেরবানী হওয়া সন্দেহহীন বিষয়।

নবম ফায়দা ঃ তাকওয়াওয়ালাদের মধ্যে সতর্ক ব্যক্তিদের স্তরের বর্ণনা। কেননা সতর্ক হওয়া একটি ব্যাপক অর্থবাহক শব্দ। আর কি কারণে সতর্ক হইবে তাহা এই শব্দের পরে উল্লেখ করা হয় নাই। তাই যতগুলি কারণে সতর্ক হওয়া সম্ভব অত্র আয়াতে উল্লিখিত শব্দ ইহাদের প্রত্যেকটি শামিল করে।

তাকওয়াওয়ালাদের কোন শয়তানী খেয়াল স্পর্শ করিলেও তাহাদের তাকওয়া তাহাদিগকে স্বীয় প্রভুর নাফরমানীর মধ্যে অটল থাকিতে দেয় না। বরং তাহাদের তাযাক্কুর অর্থাৎ তাহাদের সতর্কতা তাহাদিগকে স্বীয় প্রভুর দিকে ফিরাইয়া লইয়া যায়। তাহাদের তাযাক্কুর অর্থাৎ সতর্কতা বিভিন্ন প্রকারের। কোন কোন লোক তো নাফরমানী থেকে ফিরিয়া আসিলে সওয়াব পাইবে এই আশায় সতর্ক হইয়া যায়। আবার কেহ কেহ আযাবের ভয়ে, কেহ কেহ এই

ভয়ে যে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহর সামনে হিসাব দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হইতে হইবে। সুতরাং সে আল্লাহর নাফরমানী থেকে সতর্ক হইয়া যায়। কেহ কেহ স্বরণ করে যে, নাফরমানী বর্জন করা বড়ই সওয়াবের কাজ। আবার কেহ কেহ আল্লাহ পাকের প্রদত্ত অতীত নিয়ামতের কথা স্বরণ কলিয়া নাফরমানী করিতে লজ্জা বোধ করে। কেহ কেহ আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুত এহসানের কথা স্বরণ করিয়া তাহার সাথে কুফুরী করিতে লজ্জা বোধ করে। কেহ কেহ আল্লাহর নৈকট্য লাভকে স্বরণ করে। কেহ কেহ স্বরণ করে যে, আল্লাহ পাক পরিব্যাপ্তকারী। কেহ কেহ স্বরণ করে যে, আল্লাহ সবকিছু দেখিতে পান। সুতরাং তাঁহার নাফরমানী কিভাবে করা যায়? কেহ কেহ আল্লাহ পাকের ওয়াদার কথা স্বরণ করে। কেহ কেহ স্বরণ করে যে, গোনাহের স্বাদ অস্থায়ী কিন্তু ইহার শাস্তি স্থায়ী। তাই আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে বাঁচিয়া থাকে। কেহ কেহ আল্লাহ পাকের নাফরমানীর পরিনাম ও ইহার ফলে লজ্জিত হওয়ার কথা স্বরণ করিয়া ফিরিয়া আসে। কেহ কেহ তাঁহার ফরমাবরদারীর উপকারীতা ও ইহার ফলে প্রাপ্য সম্মানের কথা স্বরণ করিয়া ফরমাবরদারীর পথ চলিতে থাকে। কেহ কেহ স্বরণ করে যে, আল্লাহ পাকই সবকিছু কায়েম রাখেন। আবার কেহ কেহ তাঁহার মর্যাদা ও ক্ষমতার কথা স্বরণ করিয়া নাফরমানী থেকে ফিরিয়া আসে। অনুরূপভাবে যে যে জিনিসের সাথে সতর্ক হওয়া সম্পর্কিত হইতে পারে ইহাদের প্রত্যেকটি তাহাদের সতর্কতার কারণ হইতে পারে। কোন সংখ্যার মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ নয়। আমরা এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করিলাম যাহাতে তাকওয়াওয়ালাদের অবস্থাসমূহের সাথে তোমার সম্পর্ক হইয়া যায় এবং সূক্ষ্মদর্শীদের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে তুমি অবগত হইতে পার।

দশম ফায়দা : পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অত্র আয়াতে উল্লিখিত طيف (তায়ফুন) শব্দের অর্থ শয়তানী খেয়াল। অর্থাৎ স্বপ্নের ন্যায় এক প্রকার খেয়াল যাহার স্থায়িত্ব নাই। কিন্তু এই শব্দটি এখানে কুমন্ত্রনা এবং মনের ভীতিমূলক চিন্তার অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে যাহা শয়তান মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে।

মনের ভীতিমূলক চিন্তাকে طيف (তাইফ) এই জন্য বলা হয় যে, এই ধরণের চিন্তা বার বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে আসিতে থাকে যেন ইহা মনকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আর طيف শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রদক্ষিণ করা। অত্র আয়াতের জন্য কেরাতে এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন অন্য এক কেরাতে আছে। اذا مسهم طائف যখন তাহাদিগকে প্রদক্ষিণকারী স্পর্শ করে। আর কুরআন ব্যাখ্যার বিধানসমূহের মধ্যে এক বিধান এই যে, যদি এক আয়াত

একাধিক কেরাতে পড়া যায় তাহা হইলে এক কেরাত অপর কেরাতের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। অধিকন্তু কুমন্ত্রনাও মনের চারিদিকে চক্কর লাগাইতে থাকে। যখনই একীনের দেয়ালে কোন ছিদ্র পায় তখনই উক্ত ছিদ্র দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করে। আর যদি কোন ছিদ্র না পায় তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়।

অন্তর, একীনের বিভিন্ন পর্যায় এবং উহার চারিদিকে পরিবেষ্টনকারী নূরের উদাহরণ দেওয়া যায় একটি শহর ও দূর্গের দ্বারা যাহার চারিদিক সূদৃঢ় দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং অন্তর শহর ও একীনের পর্যায়সমূহ দূর্গসমূহের সাথে তুল্য। আর ইহার চারিদিকে পরিবেষ্টনকারী নূর দেওয়ালের সাথে তুলনীয়। সুতরাং যে ব্যক্তির অন্তর একীনের দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। আর স্বীয় একীনও দুরস্ত করিয়া লইয়াছে। তাহার কাছে শয়তান পৌঁছিতে পারে না। আল্লাহ পাক বলিয়াছেন-

ان عبادى ليس لك عليهم سلطان *

নিশ্চয় আমার খাছ বান্দাদের উপর তোর কোন নিয়ন্ত্রন চলিবে না।

যেহেতু তাহারা নিজেরা আমার প্রকৃত দাসে পরিণত হইয়াছে। আমার নির্দেশের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণও দ্বিধা সংকোচ করে না। আমার গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সামান্যও দ্বন্দ্ব করে না। বরং আমার প্রতি তাওয়াক্কুল করে। নিজকে আমার কাছে সমর্পন করিয়া দিয়াছে। আর এই জন্যই আল্লাহ পাক তাহাদিগকে সাহায্য সহযোগীতা করেন। তাহাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখেন। তাহারা নিজেদের অন্তরসমূহকে আল্লাহর দিকে ঝুঁকাইয়া দিয়াছে ফলে আল্লাহ পাকও তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইয়া গিয়াছেন। কোন বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, শয়তানের মোকাবিলায় আপনি কিভাবে মুজাহিদা করিয়া থাকেন। তিনি জবাব দিলেন শয়তান আবার কোন বালা? আমরা তো আমাদের সমস্ত শক্তি সাহস আল্লাহর প্রতি ঝুঁকাইয়া দিয়াছি। ফলে আল্লাহ পাক আমাদের জন্য যথেষ্ঠ হইয়াছেন।

তাহার এই জবাবের সারকথা এই যে, আমাদের মুজাহিদা করার প্রয়োজনই হয় না। আমাদের পক্ষ হইতে আল্লাহ পাকই শয়তানকে দূরে সরাইয়া রাখেন।

আমি শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ)-এর মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন, আল্লাহ পাক যখন فاتخذوه عدوا নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের দুশমন; তোমরা

তাহাকে দুশমন মনে কর। বলিলেন, তখন তাঁহার সতর্কবাণীর অর্থ অনেকে এইরূপ বুঝিয়াছে যে, অত্র আয়াতে আল্লাহর উদ্দেশ্য হইল মানুষ শয়তানের সাথে শত্রুতা পোষণ করিবে। তাই তাহারা শয়তানের শত্রুতায় নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিল। ফলে ইহা তাহাদিগকে নিজেদের মাহবুব হইতে গাফেল করিয়া দিল। আর অনেকে নিজেদের মাহবুব হইতে গাফেল করিয়া দিল। আর অনেকে এই আয়াতের অর্থ এইভাবে বুঝিল যে, শয়তান তোমাদের দুশমন। সুতরাং আল্লাহ তোমাদের বন্ধু। কারণ কোন কিছুর পরিচয় লাভের একটি সাধারণ নীতি হইল যে, কোন জিনিস ইহার বিপরীত জিনিস দ্বারা চিনা যায়। সুতরাং শয়তানকে দুশমন করিয়া ঘোষণা করার অপরিহার্য অর্থ হইল আল্লাহ বান্দার বন্ধু। তাই তাহারা আল্লাহকে মহব্বত করায় লাগিয়া গেল। ফলে আল্লাহ পাক তাহাদের জন্য যথেষ্ঠ হইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি উপরে উল্লিখিত বুযুর্গের কিস্সা বর্ণনা করিলেন।

দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের অবস্থা এই যে, যদি তাহারা শয়তানি থেকে পরিত্রান প্রার্থনা করে তাহাও এই জন্য করে যে, শয়তান থেকে পরিত্রান প্রার্থনা করা আল্লাহর হুকুম। এই জন্য নহে যে, তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও ক্ষমতা আছে বলিয়া স্বীকার করে। তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও ক্ষমতা কিভাবে স্বীকার করিতে পারে যখন তাহারা আল্লাহ পাকের বাণী শুনিয়াছে

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ وَ اَمَرَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ *

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও কথা চলে না। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহার ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিও না। অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا *

নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ *

নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোর কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ চলিবে না। অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ *

যাহারা ঈমান গ্রহণ করিয়াছে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করিয়াছে তাহাদের উপর তাহার কোন শক্তি চলে না।

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন

وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ *

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহই তাহার জন্য যথেষ্ঠ।

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ *

আল্লাহ পাক ঈমানদারদের অভিভাবক। তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে লইয়া যান।

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ *

মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

সুতরাং উল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং উল্লিখিত বিষয়বস্তুর অনুরূপ বিষয়বস্তু মুমিনদের অন্তর মজবুত করিয়া দিয়াছে এবং প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে। যদি তাহারা শয়তানের হাত থেকে পরিত্রান প্রার্থনা করে তাহা হইলে ইহা করিয়া থাকে আল্লাহ পাকের নির্দেশ আছে বলিয়া।

যদি ঈমানী নূরের দ্বারা শয়তানের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে তাহাও আল্লাহ পাকের সহায়তায়। আর যদি তাহার ধোকা-বাজী হইতে নিরাপদ থাকে তাহাও আল্লাহ পাকের সহায়তা ও এহসানের মাধ্যমে।

শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলিয়াছেন, কোন এক সফরে থাকা অবস্থায় কোন এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হইল। সে আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করিল এবং বলিল যে আমলের তৌফিক পাওয়ার জন্য لا حول و لا قوة الا بالله অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী কোন কথা নাই। আল্লাহর দিকে দৌড়াইয়া যাওয়া এবং তাঁহার কাছে আশ্রয় লওয়া অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ কোন কার্য নাই। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করে সে সোজা রাস্তা দিয়া চলিয়া যায়।

অতঃপর সে নিজের অবস্থা সম্পর্কে বলিল, بسم الله আল্লাহ পাকের নামের সাহায্যে প্রার্থনা করিতেছি।

فررت الى الله আমি আল্লাহ তাআলার দিকে ধাবিত হইয়াছি।

اعتصمت بالله আমি আল্লাহর আশ্রয় করিয়াছি।

و لا حول و لا قوة الا بالله গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং ইবাদতে শক্তি পাওয়া একমাত্র আল্লাহর সাহায্যেই হয়।

و من يغفر الذنوب الا الله আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ গোনাহ মাফ করিতে পারে?

সে আরও বলিল, بسم الله জিহবার কথা যাহা অন্তর থেকে বাহির হইয়া আসে। فررت الى الله ইহা রূহ এবং আত্মার অবস্থা اعتصمت بالله। ইহা বিবেক ও নফসের অবস্থা।

لا حول و لا قوة الا بالله ইহা উর্ধ্ব জগতের এবং নির্দেশ জগতের অবস্থা। و من يغفر الذنوب الا الله এই বাক্যে ইঙ্গিত রহিয়াছে অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্বের এবং ইহাদের নিদর্শনের।

অতঃপর সে দোয়া করিল, হে আল্লাহ! আমি শয়তানের আমল হইতে আপনার কাছে আশ্রয় চাহিতেছি। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু ও প্রতারক।

অতঃপর শয়তানকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, তোর সম্পর্কে আল্লাহ পাক খুব ভাল ভাবেই অবগত আছেন যে, তুই পথভ্রষ্ট প্রকাশ্য দুশমন। আমি আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান লইয়াছি। তাঁহার প্রতি ভরসা করিয়াছি। আল্লাহর কাছে তোর হাত থেকে পরিত্রান পাওয়ার আশ্রয় চাহিতেছি। যদি তাঁহার নির্দেশ না হইত তাহা হইলে তোর হাত থেকে নিস্তারও চাহিতাম না। তোর হাত থেকে নিস্তার চাহিতে হইবে তুই এমনকি জিনিস? কেননা আল্লাহ পাক তো মহাপরাক্রমশালী, শক্তিমান। সুতরাং তাহার কাছে এমন জিনিস হইতে নিস্তার চাহিতে হইবে যাহা খুব মারাত্মক ও ভয়ানক হয়। আর তুই কি জিনিস? তুই তো অসহায়।

হে শ্রোতা! তুমি হয়ত বুঝিতে সক্ষম হইয়াছ যে তাহাদের অন্তরে শয়তানের এতটুকুও স্থান নাই যে শয়তানের শক্তি ও সামর্থ্য থাকিতে পারে। অর্থাৎ তাহাদের ধারণা যে, শয়তানের কোন এখতিয়ার নাই এবং কোন কিছু করার শক্তিও তাহার নাই।

শয়তানের সৃষ্টি রহস্য

শয়তান এমন এক সৃষ্টি যাহার দিকে গোনাহের কারণ সমূহের এবং কুফর, অসতর্কতা, ও ভুল প্রভৃতির অস্তিত্বের সম্পর্ক করা হয়। যেমন কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে

و ما انسانيه الا الشيطان *

হযরত ইউশা (আঃ) বলিলেন, শয়তান ব্যতীত অন্য কেহ আমাকে ইহা ভুলাইয়া দেয় নাই।

অন্য এক স্থানে বলা হইয়াছে هذا من عمل الشيطان হযরত মুসা বলিলেন যে, কিবতীকে হত্যা করা শয়তানের আমলের কারণে হইয়াছে। সুতরাং শয়তান সৃষ্টির হেকমত হইল উল্লিখিত কার্যগুলির ন্যায় বিভিন্ন কার্যের ময়লা আবর্জনা তাহার গায়ে মুছা। এই জন্য কোন এক বুযুর্গ বলিয়াছেন যে, শয়তান এই জগতকে পরিস্কার করে। সমস্ত গোনাহ অপরাধ এবং অপবিত্র আমলের ময়লা আবর্জনা তাহার দ্বারা মুছিয়া ফেলা যায়। আল্লাহ যদি চাহিতেন যে জগতে গোনাহ না হউক তাহা হইলে শয়তানও সৃষ্টি করিতেন না।

শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলিয়াছেন, শয়তান পুরুষতুল্য। আর নফস (প্রবৃত্তি) নারী তুল্য। উভয়ের সংস্পর্শে গোনাহ জন্ম লাভ করে। যেমন পুরুষ নারীর সংস্পর্শে তাহাদের মধ্য হইতে সন্তান জন্ম লাভ করে। পিতামাতা কখনও সন্তান সৃষ্টি করে না। তবে তাহাদের মাধ্যমে সন্তান প্রকাশ পায় মাত্র। শায়খ আবুল হাসান সাহেবের এই ইরশাদের মূল কথা এই যে, যেমন যে কোন বিবেকবান এই বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ পোষন করিবে না যে, সন্তান পিতা মাতা জন্ম দিয়াছে; কিন্তু সৃষ্টি করে নাই। যেহেতু উভয়ের মাধ্যমে সন্তান প্রকাশ লাভ করিয়াছে। সেহেতু সন্তানকে উভয়ের দিকে সম্পর্কিত করা হইয়া থাকে। বলা হইয়া থাকে এই সন্তান অমুক পিতা মাতার। অনুরূপভাবে কোন ঈমানদারের এই বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, গোনাহ নফস ও শয়তানের সৃষ্টি নয়। বরং ইহাদের মাধ্যমে গোনাহ প্রকাশিত হইয়াছে। এই জন্য ইহাদের দিকে গোনাহ সম্পর্কিত করা হইয়া থাকে। তবে এই সম্পর্ক সৃষ্টিগত নয় বরং প্রকাশগত। সৃষ্টিগত সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ পাকের সাথে।

আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহ ও মেহেরবাণীর দ্বারা ইবাদত সৃষ্টি করিয়াছেন। অনুরূপভাবে তিনি ন্যায়পরায়নতার গুণের চাহিদায় গোনাহ ও নাফরমানী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি নিজেই ইরশাদ করিয়াছেন−

قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَمَالِهٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا *

হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি বলিয়া দিন যে, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। সুতরাং তাহাদের কি হইল যে, তাহারা কথাই বুঝে না।

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْئٍ *

আল্লাহ পাক সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ *

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা আছে কি?

অন্য এক স্থানে ইরশাদ করিয়াছেন

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ *

তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন আর যে সৃষ্টি করিতে পারে না উভয় কি সমান সমান? তবে কি তোমরা বুঝিতেছ না? অনুরূপভাবে আরও অনেক আয়াত রহিয়াছে যাহা ঐ দলের কোমর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে যাহারা দাবী করে যে, ভাল ভাল কল্যাণকর জিনিসের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক। আর নাফরমানী ও অপরাধমূলক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক নহেন। অন্য একটি আয়াতে দেখ আল্লাহ পাক ঘোষণা করিতেছেন-

وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُوْنَ *

আল্লাহ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমরা যাহা আমল কর তাহাও সৃষ্টি করিয়াছেন। অত্র আয়াতে ব্যবহৃত " ما " শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ ভাল ও খারাপ উভয় প্রকার কর্ম বুঝানো হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, ভাল এবং খারাপ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ পাক।

এই দলের পক্ষ হইতে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ *

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক মন্দ জিনিসের নির্দেশ দেন না। প্রশ্ন হইল যে, অত্র আয়াত থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ পাক যেহেতু মন্দ জিনিসের নির্দেশ দেন না সুতরাং তিনি ইহা সৃষ্টি করিবেন কিভাবে? এই প্রশ্নের জবাব এই যে, অত্র আয়াতে 'আমর' (নির্দেশ) শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। 'আমর' এক জিনিস আর 'কাযা' (সৃষ্টি) অন্য জিনিস। শরয়ী বিধানের নির্দেশ হইল 'আমর' আর সৃষ্টি সম্পর্কিত হুকুমের নাম 'কাযা'।

আল্লাহ পাক যাহা করেন না বলিয়া অত্র আয়াতে বলা হইয়াছে উহার সম্পর্ক আমরের সাথে বা শরয়ী বিধানের সাথে। আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত যাহা দাবী করিতেছে তাহা হইল সৃষ্টি সম্পর্কিত।

অন্য একটি আয়াতে রহিয়াছে

مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَ مَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ *

তোমার কাছে মঙ্গলময় যাহা কিছু পৌঁছে তাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে আর মন্দ যাহা কিছু পৌঁছে তাহা তোমার নিজের পক্ষ হইতে। অত্র আয়াতের মাধ্যমেও প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, এখানেও তো ভাল জিনিসের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে করা হইয়াছে। আর মন্দ জিনিসের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে না করিয়া বান্দার সাথে করা হইয়াছে।

এই প্রশ্নের জবাব এই যে, অত্র আয়াতে বান্দাদিগকে আদব কায়দা শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং আমাদিগকে হুকুম করা হইয়াছে আমরা যেন ভাল জিনিস তাঁহার সাথে সম্পর্কিত করি। কেননা ভাল জিনিসের সম্পর্ক তাহার সাথে হওয়াই তাঁহার জন্য উপযুক্ত। আর মন্দ জিনিসের সম্পর্ক যেন আমাদের নিজেদের দিকে করি। কেননা আমাদের নিকৃষ্ট অস্তিত্বের সাথে ইহাই সামঞ্জস্য রাখে। আর এইরূপ করা সুন্দর আদবের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত খিজির (আঃ)-এর ঘটনাতেও অনুরূপ উহাহরণ পাওয়া যায়। নৌকা নষ্ট করিয়া দেওয়ার সময় তিনি বলিয়াছেন

فاردت ان اعيبها *

আমি ইচ্ছা করিয়াছি এই নৌকাটি দূষিত করিয়া দেওয়া।

ইয়াতীম শিশুদ্বয়ের দেওয়াল দুরস্ত করিয়া দেওয়ার সময় তিনি বলিয়াছেন

فاراد ربك ان يبلغا اشدهما *

তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিয়াছেন যে, এই ইয়াতীম বালকদ্বয় যেন প্রাপ্ত বয়স্ত হওয়া পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। লক্ষ্য কর নৌকা দূষিত করার সময় ইচ্ছার সম্পর্ক করিয়াছেন নিজের সাথে। আর প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ প্রদানের সময় ইচ্ছার সম্পর্ক করিয়াছেন আল্লাহর সাথে। সুতরাং দূষিত করা মন্দ কাজ। কাজেই ইহা নিজের প্রতি সম্পর্কিত করিয়াছেন। আর প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ দেওয়া ভাল কাজ। সুতরাং ইহা স্বীয় প্রভুর দিকে সম্পর্কিত করিয়াছেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলিয়াছেন.

وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ *

যখন আমি অসুস্থ হইয়া পড়ি তখন তিনি আমাকে আরোগ্যতা দান করেন। এখানে এই কথা বলেন নাই যে, যখন তিনি আমাকে অসুস্থতা দান করেন তখন তিনি আমাকে আরোগ্যতা দান করেন। বরং অসুস্থতার সম্পর্ক নিজের দিকে করিয়া বলিয়াছেন যে, যখন আমি অসুস্থ হইয়া পড়ি। আর আরোগ্য লাভের সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি আমাকে আরোগ্যতা দান করেন। অথচ আরোগ্যতার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক। অনুরূপভাবে অসুস্থতার সৃষ্টিকর্তাও আল্লাহ পাক।

সুতরাং ما اصابك من حسنة فمن الله এই বাক্যের অর্থ মঙ্গলময় জিনিস আল্লাহর পক্ষ হইতে সৃষ্টিগতভাবে। আর و ما اصابك من سيئة فمن نفسك ইহার অর্থ মন্দ কাজ তোমার পক্ষ হইতে কৃত হওয়া হিসাবে। অর্থাৎ ইহা তুমি সম্পাদন করিয়া থাক। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, الخير بيدك و الشر ليس اليك কল্যাণ তো আপনারই হাতে কিন্তু মন্দ জিনিস আপনার প্রতি সম্পর্কিত নহে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবগত ছিলেন যে, আল্লাহ পাক ভাল মন্দ উভয়ের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই লাভ-লোকসানের মালিক। কিন্তু প্রকাশ করিবার সময় আদবের প্রতি খেয়াল করিয়া তিনি বলিলেন যে, কল্যাণ আল্লাহর হাতে কিন্তু মন্দ জিনিস তাঁহার প্রতি সম্পর্কিত নয়।

এই পথভ্রষ্ট দলটি আরও একটি প্রশ্ন করিতে পারে যে, আল্লাহ পাক নাফরমানী ও অপরাধমূলক কার্য সৃষ্টি করা হইতেও পবিত্র। কেননা নাফরমানী ও অপরাধ মন্দ জিনিস। আল্লাহ পাক মন্দ জিনিস সৃষ্টি করিতে পারেন না। তিনি ইহা হইতেও পবিত্র। তাহাদের এই প্রশ্নের জবাব এই যে, নাফরমানী ও অপরাধমূলক কাজ বান্দার দিকে সম্পর্কিত হইলে মন্দ হইয়া যায়। কেননা বান্দার নাফরমানী ও অপরাধের অর্থ আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করা। সুতরাং ইহা মন্দ। প্রকৃতপক্ষে যে কাজটি মন্দ তাহা জন্মগত দিক বিচারে মন্দ নয়। বরং ইহাতে মন্দতা আসিয়াছে ইহা করা নিষিদ্ধ বলিয়া। অনুরূপভাবে যে কাজটি করা ভাল তাহা জন্মগত দিক বিচারে করা ভাল এমন কথা নয় বরং ইহার মধ্যে উত্তমতা আসিয়াছে ইহার করার নির্দেশ রহিয়াছে বলিয়া। কিন্তু আল্লাহর দিকে উভয় কাজকে সম্পর্কিত করিলে বলিতে হইবে যে, উভয় আল্লাহর মাখলুক। এই পর্যায় উভয় একই স্তরের ভালমন্দের বিচারের উর্ধ্বে। কবি বলেন-

کفر هم نسبت بخالق حکمت + چون بما نسبت کنی کفر آفت ست

সৃষ্টিকর্তার দিকে সম্পর্ক হিসাবে কুফরও একটি হেকমত। যখন তুমি ইহাকে আমার দিকে সম্পর্কিত করিবে তখন কুফর একটি বিপদ।

অতঃপর যদি তাহারা আল্লাহ সম্পর্কে বলিতে গিয়া এতটুকু বলে যে, আল্লাহ পাক নাফরমানী ও অপরাধ সৃষ্টি করা হইতে পবিত্র। তাহা হইলে তাহাদের কথা দ্বারা আল্লাহ পাকের একগুণে ত্রুটি প্রমাণ হয় তাহা তাহারা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে। যেমন তাহারা যদি বলে যে, আল্লাহ পাক নাফরমাণী ও অপরাধ সৃষ্টি করা হইতে পবিত্র। তাহা হইলে তাহাদের মোকাবিলায় আমরা বলিব যে, আল্লাহ পাকের রাজত্বে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু হওয়া হইতেও আল্লাহ পবিত্র। অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত তো কোন কিছু হইতেই পারে না। যদি নাফরমানী ও অপরাধ সৃষ্টি থেকে তিনি পবিত্র হন। আর ইহার সৃষ্টিকর্তা অন্য কেহ হয়। তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীতও অন্য কেহ সৃষ্টি করিতে সক্ষম। সুতরাং ইহার সৃষ্টির সাথে তাঁহার ইচ্ছার সম্পর্ক না হইলেও অসুবিধা নাই। ইহার দ্বারা অপরিহার্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের রাজত্বে তাঁহার ইচ্ছার পরিপন্থীও কোন কাজ হইতে পারে। আর ইহা তাঁহার ত্রুটির দলীল। তাহাদের অভিমত মানিয়া লওয়ার পর আল্লাহ পাকের ত্রুটি প্রমাণিত হয়। কবি বলেন-

دوستی بے دشمنی ست + حق تعالی زتین چنین خد ما غنی ست

জ্ঞানহীনের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা। আর আল্লাহ পাক এই ধরণের খেদমতের মুখাপেক্ষী নহেন।

খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও; আল্লাহ পাক আমাদিগকে এবং তোমাদিগকে যেন সোজা পথে পরিচালনা করেন এবং স্বীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে যেন সত্য দ্বীনের উপর কায়েম রাখেন।

তদবীরের ফায়দা এবং তকদীরের অনানূকল্য

আল্লাহ পাক বলেন-

وَ مَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا وَ اِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ * اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

ইবরাহীম ধর্মমত হইতে ঐ ব্যক্তিই মুখ ফিরাইয়া রাখে যে মূলতঃ নির্বোধ

হয়। আর আমি তাহাকে দুনিয়াতে মনোনীত করিয়াছি এবং তিনি আখেরাতে অতি মহৎ লোকদের মধ্যে পরিগণিত। যখন তাহাকে তাঁহার প্রভু বলিলেন, অনুগত হও, তিনি বলিলেন, আমি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের অনুগত হইলাম। তিনি আরও বলিয়াছেন-

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَام *

নিশ্চয়ই একমাত্র ইসলামই আল্লাহর কাছে ধর্ম।

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ *

তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। তিনি পূর্ব হইতেই তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন।

অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন-

فله اسلموا *

এবং তাঁহার অনুগত হইয়া যাও।

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ *

যদি তাহারা আপনার সাথে বিতর্ক করিতে আসে তখন আপনি বলিয়া দিন আমি স্বীয় মুখ মন্ডলকে আল্লাহ পাকের দিকে অনুগত করিয়াছি এবং যাহারা আমার অনুসরণ করে তাহারাও।

তিনি আরও বলেন-

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ *

এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে দ্বীন হিসাবে অনুসরণ করে তাহা কখনও গ্রহণীয় হইবে না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

তিনি আরও বলেন-

وَ مَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى *

যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে স্বীয় চেহারাকে অনুগত করিয়াছে আর সে সৎকার্য করে। নিঃসন্দেহে সে মজবুত রশি ধারণ করিয়াছে।

অন্য এক স্থানে বলেন-

تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ *

হে আল্লাহ! আমাকে মুসলমানী অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে নেককারদের সাথে মিলাইয়া দিন।

তিনি বলেন-

و انا اول المسلمين *

এবং আমি প্রথম মুসলমান।

অনুরূপ অর্থবোধক আরও অনেক আয়াত রহিয়াছে। এখানে একটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য যে, ইসলামকে বার বার উল্লেখ করা ইহার উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ বহন করে। ইসলামের রহিয়াছে একটি বাহ্যিক রূপ এবং একটি আভ্যন্তরিন রূপ। ইসলামের বাহ্যিকরূপ হইল ইহার আহকাম পালন করা। আভ্যন্তরিন রূপ হইল ইহার অনানুকূল্য হইতে বিরত থাকা। সুতরাং ইসলাম মানবের দেহের অংশ বিশেষ। অর্থাৎ ইহার সম্পর্ক বাহ্যিক দেহের সাথে। আর অনানুকূল্য হইতে বিরত থাকা এবং নিজকে সোপর্দ করিয়া দেওয়া অন্তরের অংশ বিশেষ। অতএব ইসলাম মানবের বাহ্যিক আকৃতির তুল্য। আর নিজকে সোপর্দ করিয়া দেওয়া ইহার অভ্যন্তর। সুতরাং খাঁটি মুসলিম এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ পাকের নির্দেশগুলি পালন করিয়া বাহ্যিকভাবে নিজকে তাঁহার অনুগত করিয়া রাখে আর তাঁহার নির্দেশের সামনে স্বীয় অন্তর ঝুঁকাইয়া দেয়। নিজকে সোপর্দ করার প্রকৃত পর্যায় হইল আল্লাহ পাকের আহকামের পরিপন্থীতা হইতে দূরে থাকা এবং ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে নিজকে তাঁহার কাছে অর্পন করিয়া দেওয়া। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বীয় ইসলামের দাবী করে তাহার কাছে চাহিদা হইল সে যেন নিজকে সোপর্দ করিয়া দেয়। তাহাকে বলা হইবে যে, যদি তুমি স্বীয় দাবীতে সত্য হও তাহা হইলে দলীল পেশ কর।[১]।

তোমরা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখ হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে যখন আল্লাহ বলিয়াছিলেন "তুমি ইসলাম লও" তখন তিনি বলিয়াছিলেন আমি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ইসলাম লইয়াছি।

১। অর্থাৎ নিজকে সোপর্দ করিয়া দেখাও। (অনুবাদক)

অতঃপর যখন তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার জন্য চরকগাছে বসানো হইয়াছিল। তখন ফিরিশতাগণ তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। হে প্রভু। তিনি আপনার পরমবন্ধু। তাঁহার প্রতি যে বিপদ নামিয়া আসিয়াছে আপনি তাহা খুব ভালভাবেই জানেন। আল্লাহ পাক তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে নির্দেশ দিলেন হে জিবরাঈল! তুমি তাঁহার কাছে যাও; যদি সে তোমার কাছে সাহায্য চায়; তখন তুমি তাহাকে সাহায্য করিও। আর যদি সাহায্য না চায় তাহা হইলে আমি জানি আর সে জানে। আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার পর হযরত জিবরাঈল (আঃ) শূন্যে ভর করিয়া তাঁহার সামনে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি জবাব দিলেন, আপনার কাছে নাই। হ্যাঁ, আল্লাহর কাছে রহিয়াছে।" হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, তাহা হইলে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি জবাব দিলেন, যেহেতু তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন, সুতরাং দোয়া করার কি প্রয়োজন?

লক্ষ্য করুনঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। এমনকি অন্য কাহারও প্রতি তাঁহার ইচ্ছা ঝুঁকেও নাই। বরং আল্লাহ পাকের ফয়সালার প্রতি গর্দান ঝুঁকাইয়া দিয়াছেন। স্বীয় ব্যবস্থা অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি, স্বীয় নেগরানীর পরিবর্তে আল্লাহর নেগরানীর প্রতি, স্বীয় দো'আর উপর ভরসা না করিয়া আল্লাহ পাকের ইলমের প্রতি নির্ভর করিয়াছেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাক তাঁহার প্রতি অনুগ্রহশীল- মেহেরবান। আল্লাহ পাকও তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন-

و ابرهيم الذى وفى *

ইবরাহীম এমন এক ব্যক্তি যে নিজের কথা পুরা করিয়াছে। অধিকন্তু আল্লাহ পাক তাহাকে অগ্নিকুণ্ড হইতে মুক্তি দিলেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক নিজেই বলেন-

قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ *

আমি বলিলাম, হে অগ্নি তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হইয়া যাও। আলেমগণ বলেন যে, যদি আল্লাহ পাক এখানে سلاما 'শান্তিদায়ক' শব্দ ব্যবহার না করিতেন তাহা হইলে অগ্নি এত শীতল ও ঠাণ্ডা হইয়া যাইত যে ঠাণ্ডার প্রভাবে তিনি ধ্বংস হইয়া যাইতেন। নমরূদের অগ্নিকুণ্ডের অগ্নি নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। সীরাতবিদগণ বলেন যে, তখন সমগ্র দুনিয়ার অগ্নি নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। কেননা প্রত্যেক অগ্নি মনে করিতেছিল যে, হয়তবা ইহাকেই

এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার জন্য যে রশি দিয়া বাধা হইয়াছিল অগ্নি শুধু এই রশিগুলি জ্বালাইয়া দিয়াছিল।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনার সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি বিশেষ ফায়দার কথা

প্রথম বড় ফায়দা ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রদত্ত উত্তর লক্ষ্যণীয়। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁহার সামনে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি জবাব দিলেন, আপনার কাছে নাই। লক্ষ্য কর যে তিনি এইরূপ বলেন নাই যে, আমার কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, রিসালাত ও বন্ধুত্বের চাহিদা হইল পরিষ্কারভাবে স্বীয় দাসত্ব ও মুখাপেক্ষীতার কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া। আর দাসত্বের পর্যায়ের অপরিহার্য আনুসাঙ্গিক বিষয় হইল আল্লাহ পাকের প্রতি স্বীয় প্রয়োজনের ও মুখাপেক্ষীতার কথা প্রকাশ করা এবং তাঁহার সামনে মুখাপেক্ষী হইয়া খাঁড়া হওয়া। তাঁহার ছাড়া অন্য সকলের কাছ থেকে স্বীয় ইচ্ছা উঠাইয়া লইয়া একমাত্র তাঁহার কাছেই স্বীয় ইচ্ছা নিবেদিত করা।

সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর পক্ষ হইতে এইরূপ জবাব প্রদান করাই উচিত হইয়াছে যে, আপনার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী। আপনার নয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় জবাবের মধ্যে উভয় কথা একত্রিত করিয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি স্বীয় মুখাপেক্ষীতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যক্তির কাছে স্বীয় ইচ্ছা ব্যক্ত না করার ঘোষণা দিয়াছেন।

কোন কোন লোক বলিয়া থাকে যে, সুফী তখনই সুফী হইতে পারে যখন আল্লাহর কাছেও তাহার প্রয়োজন না থাকে। এই ধরণের কথা অনুসরণযোগ্য ও পরিপূর্ণতার অধিকারী কোন ব্যক্তির থেকে হইতে পারে না। অবশ্য অন্য দিকে খেয়াল করিলে তাহাদের এই উক্তির বিশুদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। তাহা এই যে, সুফীর বিশ্বাস হইয়াছে যে, আল্লাহ পাক তাহাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাহার সমস্ত প্রয়োজন পুরা করিয়াছেন। সুতরাং তাহার সমস্ত প্রয়োজন তাহার জন্মের পূর্বে আযলেই পুরা হইবে। অধিকন্তু তাহার এখন প্রয়োজন না থাকা আল্লাহর প্রতি তাহার মুখাপেক্ষীতা না থাকাকে প্রমাণ করে না। বরং প্রয়োজন না থাকা মুখাপেক্ষী হওয়ার পরিপন্থী নয়। সুতরাং এখন প্রয়োজন অবশিষ্ট না থাকিলেও তাহারা আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী।

মোটকথা, বান্দার প্রয়োজন পুরা হউক বা না হোক উভয় অবস্থায় বান্দা আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী।

সুতরাং উল্লিখিত উক্তির প্রবক্তা প্রয়োজন নাই বলিয়া বলিয়াছেন। বান্দা আল্লাহর মুখাপেক্ষী নয় এমন কথা বলেন নাই। কেননা আল্লাহর প্রতি বান্দার মুখাপেক্ষী হওয়া বান্দা হওয়ার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

উল্লিখিত উক্তির দ্বিতীয় আর একটি ব্যাখ্যা হইতে পারে যে, সূফী নিজে আল্লাহকে তালাশ করে। তাহার কাছে কোন প্রয়োজন তালাশ করে না। তৃতীয় আর একটি ব্যাখ্যা ইহা হইতে পারে যে, সুফী সর্বদা আল্লাহ পাকের কাছে নিজকে সমর্পন করিয়া রাখে। তাঁহার সামনে নত শির হইয়া থাকে। সুতরাং আল্লাহ পাকের চাহিদাই তাহার চাহিদা। সুতরাং আল্লাহ পাকের কাছে তাহার কোন প্রয়োজন থাকে না।

দ্বিতীয় বড় ফায়দা ঃ হযরত জিবরাঈল (আঃ) যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে প্রশ্ন করিলেন, আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি (আঃ) জবাব দিলেন, আপনার কাছে কোন প্রয়োজন নাই। তবে আল্লাহ পাকের কাছে আছে। কোন কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁহার জবাবের অর্থ ইহা বুঝিয়াছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁহার কাছে সাহায্য চাহিবেন না। তাঁহার অন্তর আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রত্যক্ষ করিতেছে না। তখন তিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে পরামর্শ দিলেন যে, তাহা হইলে তাঁহার কাছেই প্রার্থনা করুন। অর্থাৎ যদি আপনি এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে, কোন মাধ্যমের কাছে কোন কিছু চাহিবেন না। আর এই কারণে আমার কাছে কোন প্রকার সাহায্যের কথা বলিতেছেন না। তাহা হইলে আপনি স্বীয় পরোয়ারদিগারের কাছেই প্রার্থনা করুন। কেননা তিনি আমার অপেক্ষাও আপনার অধিক নিকটবর্তী। হযরত ইবরাহীম (আঃ) জবাব দিলেন, তিনি তো আমার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত। সুতরাং ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট। তাঁহার কাছে চাওয়ার প্রয়োজন মনে করি না। তাঁহার উক্তির সারকথা হইল আমি খুব চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে আমি তাহাকে তাহার কাছে প্রার্থনা করা অপেক্ষা অনেক নিকটে পাইয়াছি এবং তাঁহার কাছে প্রার্থনা করাকেও একটি মাধ্যম মনে করিতেছি। আমি তাঁহার ব্যতীত অন্য কোন জিনিস অবলম্বন করিতে চাই না। অধিকন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ পাক সবকিছু জানেন। সুতরাং তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়া তাহাকে স্বরণ করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। কেননা তিনি তো ভুলিয়া যান না। সুতরাং তিনি আমার প্রতি খেয়াল না করার

কোন সম্ভাবনা নাই। এইজন্য আমি তাঁহার কাছে না চাহিয়া তাঁহার জ্ঞানই আমার সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ঠ মনে করিয়া বসিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহে কোন অবস্থায়ই আমাকে ছাড়িবেন না। আল্লাহকে যথেষ্ঠ মনে করা ইহাকেই বলে। আর ইহারই নাম حسبى الله (আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ঠ।) এর হক আদায় করা।

আমাদের শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ) و ابرهيم الذى وفى ইবরাহীম পুরা করিয়া দিয়াছেন। এই আয়াতের তফসীর করিয়াছেন حسبى الله এর সারকথা দ্বারা। অর্থাৎ আল্লাহ পাককে অবলম্বন করার ক্ষেত্রে জমিয়া বসিয়াছেন অন্য কোন দিকে দৃষ্টি করেন নাই। অবশ্য কোন কোন তফসীরকার এইরূপ তফসীর করিয়াছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) মেহমানকে আহার দিয়াছেন। স্বীয় পুত্রকে কুরবানী করিয়াছেন। জলন্ত অগ্নিতে নিজকে প্রবিষ্ট করিয়াছেন। তাই আল্লাহ পাক তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন 'ইবরাহীম পুরা করিয়া দিয়াছেন।'

তৃতীয় বড় ফায়দা ঃ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ফিরিশতাদের সামনে বলিলেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব। অর্থাৎ আদম এবং আদম সন্তানদের সৃষ্টি করিব। ফিরিশতাগণ বলিল, আপনি পৃথিবীর বুকে এমন এক জাতি সৃষ্টি করিবেন যাহারা তথায় খুনাখুনি ও ফাসাদ করিবে? আমরা তো আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। আপনার গুণাগুণ বর্ণনা করিয়া আপনার প্রশংসা করিতেছি। তাহাদের এই বক্তব্যের সারকথা আল্লাহ পাক যেন তাহাদিগকে প্রতিনিধি নিয়োগ করেন।

তাহাদের এই বক্তব্যের জবাবে আল্লাহ পাক বলিলেন, আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত জিবরাঈলের (আঃ) কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। আল্লাহ পাক ফিরিশতাদের জবাবে যাহা বলিয়াছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এই কার্য এই ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে সুদৃঢ় দলীল হিসাবে খাঁড়া হইল। যেন আল্লাহ পাক বলিতেছেন এই সকল ফিরিশতা এখন কোথায় যাহারা আমার নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে আপত্তি উথাপন করিয়াছিল যে, তাহারা দুনিয়াতে খুনাখুনি ও ফাসাদ করিবে? তোমরা আমার বান্দা ইবরাহীমকে কেমন পাইয়াছ?

ইহা দ্বারা আল্লাহ পাকের 'আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না' এই বাণীর ব্যাখ্যা হইয়া গেল।

হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-

পালাক্রমে ফিরিশতাগণ দুনিয়াতে আসিতে থাকেন। আবার পালাক্রমে আসমানে পৌঁছিতে থাকেন। তখন আল্লাহ পাক তাহাদের কাছে বান্দাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দাদিগকে কি অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছ? আল্লাহ পাক বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত থাকার পরও তাহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তাহারা জবাব দেয় যে, আমরা যখন পৃথিবীতে গিয়াছি তখন দেখিয়াছি যে, তাঁহারা (আছরের) নামাজ পড়িতেছে। আর যখন তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছি তখনও দেখিয়াছি যে, তাহারা (ফজরের) নামাজ পড়িতেছে।

হাদীছের ব্যাখ্যায় আছর এবং ফজরের নামাযের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ উল্লিখিত নামাজদ্বয়ের সময়েই ফিরিশতারা আসা যাওয়া করে।

শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলিয়াছেন যে, বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে ফিরিশতাদের কাছে আল্লাহ পাকের জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য এই যে, হে আপত্তিকারকরা! তোমরা আমার বান্দাদিগকে কি অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছ?

অনুরূপভাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে প্রেরণ করার একই উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-এর মর্যাদা ও বড়ত্ব ফিরিশতাদের সামনে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে কি না তাহাও যেন তাহারা দেখিয়া লয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তো আল্লাহ পাককেই দেখিতেন। অন্য কাহারও দিকে দৃষ্টি দিতেন না। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উপাধি ছিল খলীলুল্লাহ। তিনি আল্লাহর খলীল। তাহাকে খলীল বলার কারণ তাঁহার শিরা উপশিরা আল্লাহ প্রেম, তাঁহার বড়ত্ব ও মহত্ব এবং তাঁহার একত্বের বিশ্বাসে ভরপুর হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও স্থান ছিল না।

কবি বলেন-

مثل جان مجه مین هو گیا پیوست + هے اسی سے خلیل نعت تری

بولتاهون تو هے میرا کلام + روزه رکهون تو تشنگی هے مری

আমার মধ্যে তুমি প্রাণের ন্যায় সম্পৃক্ত হইয়া গিয়াছ। এই কারণে তোমার উপাধি খলীল।

আমি কথা বলি, তখন তুমিই আমার বক্তব্য।
রোযা রাখি তখন তুমিই আমার পিপাসা।

সতর্কতা এবং ঘোষণা ঃ আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অন্তর স্বীয় সন্তুষ্টির নূর দ্বারা আলোকিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার রূহকে অনুগত হওয়ার গুণের দ্বারা গুণান্বিত করিয়াছিলেন। মাখলুকের দিকে দৃষ্টি করা থেকে তাঁহার অন্তরকে বিরত করিয়াছিলেন। যেহেতু তাহার অন্তর অনুগত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের কাছে সোপর্দ হইয়াছিল তাই অগ্নিকুণ্ড তাঁহার জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তিনি অনুগত হওয়ার ফলে পাইয়াছিলেন শান্তি ও নিরাপত্তা। আর স্বীয় আভ্যন্তরিন অবস্থা দুরস্ত করার দ্বারা পাইয়াছিলেন এত বড় সম্মান ও মর্যাদার আসন।

ইহা হইতে প্রত্যেক মুসলমানের অনুধাবন করা উচিত যে, যদি কেহ পরীক্ষায় পতিত হওয়ার পর আল্লাহ পাকের আনুগত্য অবলম্বন করে তাহা হইলে আল্লাহ পাক কাঁটাকে ফুলে এবং ভয়কে নিরাপত্তায় পরিনত করিয়া দেন।

সুতরাং শয়তান যখন তোমাকে অগ্নি পরীক্ষায় নিক্ষেপ করে এবং সমস্ত সৃষ্টি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি? তখন তোমার জবাব এইরূপ হওয়া উচিত যে, তোমাদের কাছে কোন প্রয়োজন নাই। তবে আল্লাহ পাকের কাছে প্রয়োজন রহিয়াছে। তোমার জবাব শুনিয়া যদি ইহারা বলে যে, তাহা হইলে আল্লাহ পাকের কাছে প্রার্থনা কর? তখন তোমার এইরূপ জবাব দেওয়া উচিত যে আমার অবস্থা সম্পর্কে তো আল্লাহ পাক সম্পূর্ণরূপে অবগত। সুতরাং তাঁহার অবগতি আমার জন্য যথেষ্ঠ। আমার প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন নাই। যদি তুমি এইরূপ কর তাহা হইলে আল্লাহ পাক দুনিয়ার অগ্নিকে তোমার জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক করিয়া দিবেন। তোমাকে সম্মান ও মর্যাদার আসন দান করিবেন। কেননা আল্লাহ পাক নবী ও রাসূলগণের মধ্যেমে হেদায়েতের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। ঈমানদারগণ তাহাদের প্রদর্শিত পথে চলিয়াছেন। একীনওয়ালা ব্যক্তিগণ তাহাদের আনুগত্য করা নিজেদের জন্য অপরিহার্য করিয়া লইয়াছেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন-

قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا و من اتبعني *

হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি বলিয়া দিন। ইহা আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসরণকারীরা বুঝিয়া শুনিয়া আল্লাহর দিকে আহবান করি।

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর সম্পর্কে বলিয়াছেন-

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ *

আমি তাঁহার দোয়া কবুল করিয়াছি এবং তাহাকে বিষাদ থেকে মুক্তি দিয়াছি। আমি ঈমানদারদিগকে এইভাবেই মুক্তি দিয়া থাকি। অর্থাৎ যাহারা হযরত ইউনুস (আঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং তাঁহার নূরের প্রেমিক হয়। নিজকে নীচ করিয়া মুখাপেক্ষীতার সাথে আমার কাছে চাহিতে থাকে। বিনয় ও মিনতির পোশাক পরিধান করে আমি তাহাকেও অনুরূপভাবে মুক্তি দিয়া থাকি।

মূল উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উল্লেখিত ঘটনায় রহিয়াছে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য শিক্ষা আর সূক্ষ্মদর্শীদের জন্য দিকনির্দেশনা। তাহা এই ভাবে যে কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর করিয়া নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতে বিরত থাকে তখন আল্লাহ পাক তাহার জন্য উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনার প্রতি লক্ষ্য কর তিনি নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতি দৃষ্টি দেন নাই বরং তাহার সমস্যা সমাধান আল্লাহ পাকের দায়িত্বে অর্পন করিয়া তাহার প্রতি নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহার এই আনুগত্যের ও নির্ভরতার ফলে তিনি লাভ করিলেন প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডেও শান্তি ও নিরাপত্তা। দুনিয়া ও আখেরাতে অধিকারী হইলেন ইয্যত ও সম্মানের এবং আজ শত সহস্র বৎসর ধরিয়া জগতবাসীর প্রশংসায় হইয়া রহিলেন অমর।

এমনকি আমাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে আমরা যেন তাঁহার ধর্মমতের বাহিরে না চলি। তিনি আমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন উহার খেয়াল করিয়া চলি। যেমন কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে-

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ *

তোমরা স্বীয় পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মমত অবলম্বন কর। তিনিই পূর্বে তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন।

সুতরাং যাহারা ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মমতের অনুসারী হয় তাহাদের জন্য উপযোগী হইল তাহারা যেন ব্যবস্থা অবলম্বন হইতে বিরত থাকে। ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মমত অবলম্বন করা হইতে নির্বোধ ব্যক্তিই ফিরিয়া থাকে। ইবরাহীমী ধর্মমতের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হইল আল্লাহর কাছে নিজকে অর্পণ করা এবং তাঁহার নির্দেশসমূহ পালন করা।

সারকথা, প্রধান উদ্দেশ্য হইল আল্লাহর সামনে বান্দার নিজস্ব ইচ্ছার অস্তিত্ব না থাকা।

এই সম্পর্কে আমাদের রচিত কবিতা রহিয়াছে। এই কবিতাতে আল্লাহ পাক বান্দাদের উদ্দেশ্য করিয়া কিছু কথা বলিয়াছেন। কবিতার মর্মকথার অনুবাদ প্রদত্ত হইল-

☆ স্বীয় ইচ্ছা দূর করিয়া দাও হে বান্দা! যদি চাও তুমি হেদায়েতের রাস্তা।

☆ স্বীয় অস্তিত্ব দেখিও না। নিজের উপর নির্ভরতা কর পরিত্যাগ। আঁকড়াইয়া ধর ধৈর্যধারণের সুদৃঢ় আংটা।

☆ কতদিন পর্যন্ত অমনোযোগী থাকিবে আমার থেকে? তুমি তো সর্বদা নিজের প্রেম ও চিন্তায় মগ্ন।

☆ কতদিন তুমি চাহিয়া থাকিবে মাখলুকের পানে?

☆ বনে-জঙ্গলে উদভ্রান্ত ঘুরিয়া বেড়াইবে।

☆ কোথায় চলিয়াছ আমার দরবার ছাড়িয়া? কেন তুমি পথভ্রষ্ট হইতেছ রাস্তা ছাড়িয়া?

☆ আমার বন্ধুত্ব অনেক পুরাতন তোমার সাথে। বরযখ যাতে আমাকে ইলাহ বলে স্বীকার করেছিলে এক বাক্যে।

☆ তোমার কি এমন কোন প্রভু আছে যাহার কাছে তুমি কোন কিছু আশা করিতে পার? যে সে তোমাকে হাশরের ময়দানে বিপদ থেকে মুক্তি দিতে পারে?

☆ যত আছে মাখলুক জানিয়া রাখ সবই অক্ষম। এক অক্ষমের কাছে যাঞ্ছা করিতেছে অপর অক্ষম।

☆ সকল মাখলুক আমার থেকেই অস্তিত্ব পাইয়াছে। 'হইয়া যাও' শব্দের মাধ্যমে ইহারা সৃষ্ট হইয়াছে।

☆ আমার ঘরে এবং আমার রাস্তায় থাকিয়া। অন্যের প্রতি তুমি করিয়াছ ভরসা।

☆ ঈমানের দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ম করিয়া তুমি দেখ। সমস্ত মাখলুক শেষ পর্যন্ত হইয়া যাইবে ধ্বংস।

☆ চলার পথ-অনস্তিত্ব থেকে শুরু করিয়া অনস্তিত্বের দিকে তুমিও

নিঃসন্দেহে এই পথেই চলিবে।

☆ আমার পোশাক [১] তোমাকে পরিধান করাইয়াছি খুলিয়া ফেলিওনা তাহা। সুতরাং হটাইয়া ফেল মাখলুক থেকে তোমার সমস্ত আশা আকাঙ্খা।

☆ সমস্ত আশা আকাঙ্খা পেশ কর দরবারে আমার- চাহিবনা তোমার কাছে কোন সম্পদ বিনিময়ে ইহার।

☆ দেখ স্বীয় অবস্থান এবং করিয়া রাখ শির নত। তোমার সমস্ত কাঙ্খিত বস্তু হইয়া যাইবে অর্জিত।

☆ বান্দায় পরিনত হও; কেননা মনিব বান্দাকে যাহা দান করে বান্দা তাহাতেই মনিবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

☆ (জানিয়া রাখ আমি এমন এক সত্ত্বা যে) স্বীয় ক্ষমতার দ্বারা তোমার সমস্ত ক্ষমতা মিটাইয়া দিব। তোমার ঔদ্ধত্য ও মূর্খতার শাস্তি প্রদান করিব।

☆ তবে কি আমার রাজত্বে তুমি অংশীদার? যাহার কারণে নির্মল ও স্বচ্ছ সত্যের ক্ষেত্রেও করিয়াছ বিবাদ?

☆ যদি পৌঁছিতে চাও তুমি দরবারে তাঁহার তাহা হইলে স্বীয় নফসের দুশমন হইয়া যাও।

☆ আমিত্ব বর্জন করার সমুদ্রে নিমজ্জিত হও; এবং না দেখ নিজের প্রতি সর্বক্ষেত্রে আমাকে তোমার আপন করিয়া লও।

☆ আমার কাছেই তুমি প্রার্থনা করিতে থাক অনুগ্রহের বারি। অতঃপর দেখ কি এহসান আমি করিতে পারি।

☆ অন্য কাহারও কাছে না কর হেদায়েত তলব- অন্য কেহ কি আছে যে তোমাকে প্রদর্শন করিতে পারিবে পথ?

বিশেষ আলোচনা

ব্যবস্থা অবলম্বন করা (তদবীর) দুই প্রকার। এক প্রকার তদবীর প্রশংসিত। অপর প্রকার নিন্দনীয়। দ্বিতীয় প্রকারের তদবীর বা ব্যবস্থা গ্রহণ তোমার জন্য ক্ষতিকর।

ইহার ক্ষতি তোমার উপরই পতিত হইবে। ইহা আল্লাহ পাকের হক আদায়ের জন্য হইবে না। দ্বিতীয় প্রকার তদবীরের উদাহরণ কোন গোনাহের কার্য করার জন্য। ব্যবস্থা অবলম্বন করা বা অসতর্ক থাকার কারণে আত্মিকভাবে

১। খিলাফতের পোশাক। অর্থাৎ আমি তোমাকে খলীফা বানাইয়াছি।

ক্ষতিগ্রস্থে পতিত হওয়া। অথবা কোন ইবাদত করিতে গিয়া লৌকিকতা ও খ্যাতি অর্জনের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। ইহা নিন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, এই সব ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা ব্যবস্থা অবলম্বনকারী শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয় অথবা ইহার দ্বারা আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মধ্যে পর্দা পড়িয়া যায়। আল্লাহ পাক যাহাকে বিবেক নামক নেয়ামত দান করিয়াছেন সে এই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গিয়া লজ্জাবোধ করিবে। আর এই আর এইসব ব্যবস্থা অবলম্বন তাহাকে আল্লাহর নৈকট্যের পর্যায়ে পৌঁছাইবে না এবং আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালবাসার সহায়ক হইবে না। আল্লাহ পাক বান্দার প্রতি যত অনুগ্রহ করিয়াছেন তন্মধ্যে বিবেক উত্তম। ইহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ-

আল্লাহ পাক সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে দুইটি উত্তম জিনিস দান করিয়াছেন। এক, তাহাদের অস্তিত্ব। দ্বিতীয়ত, তাহাদের স্থায়ীত্ব। অর্থাৎ প্রথমে তাহাদিগকে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদের স্থায়ীত্ব দান করিয়াছেন। প্রত্যেক মাখলুকের জন্য এই দুইটি নিয়ামত অত্যন্ত জরুরী। এক নিয়ামত অস্তিত্ব, দ্বিতীয় নিয়ামত স্থায়ীত্ব। এই বর্ণনার দ্বারা নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও পরিস্কার হইয়া আসে। আল্লাহ বলেন- رحمتى وسعت كل شيئ আমার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। আয়াতে উল্লেখিত রহমত তাহাই যাহা এই নিয়ামত প্রদানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হইয়াছে। যেহেতু উল্লেখিত নিয়ামত দ্বয়ে সমস্ত মাখলুক শরীক রহিয়াছে। তাই আল্লাহ পাক এক মাখলুককে অপর মাখলুক থেকে পৃথক করিতে ইচ্ছা করিলেন। যাহাতে তাঁহার ইচ্ছা ও চাহিদার গুণে ব্যাপকতা প্রকাশিত হয়। অতএব তিনি কতক মাখলুককে খুব বাড়িয়া যাওয়ার বৈশিষ্ট্য দান করিলেন। যেমন বৃক্ষরাজি, পশুপক্ষী এবং মানব। সুতরাং যে সকল মাখলুক বাড়ে না বৃদ্ধি পায় না উহাদের তুলনায় উল্লেখিত মাখলুক ত্রয়ের মর্যাদা অধিক হওয়াটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কেননা ইহাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়ার বৈশিষ্ট্য অধিক বিদ্যমান। অতঃপর উল্লিখিত মাখলুকত্রয় বৃদ্ধি পাওয়ার বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত। তাই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করিয়া ইহাদিগকে বৃক্ষলতা হইতে পৃথক করিয়াছেন। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রাণী ও মানুষ সমভাবে অংশীদার। সুতরাং বৃক্ষলতার তুলনায় উল্লিখিত মাখলুকদ্বয়ের মধ্যে আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ অধিক। অতঃপর আল্লাহ পাক প্রাণী জগতের মধ্যে মানুষ জাতিকে পৃথক করিয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাই তাহাদিগকে বিবেক দান করিলেন। আর এই নিয়ামতের মাধ্যমেই তিনি মানব জাতিকে অন্যান্য মাখলুকের উপর মর্যাদা দান করিলেন। অধিকন্তু ইহার মাধ্যমেই মানুষের প্রতি স্বীয় নিয়ামত প্রদান

পরিপূর্নতায় পৌঁছাইলেন। বিবেকের দ্বারাই মানুষ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে সফলতা লাভ করে। সুতরাং বিবেক নামক এই মহা মূল্যবান নিয়ামতকে পার্থিব জগতের ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করা আল্লাহ পাকের কাছে কোন মূল্য রাখে না। ইহা এই নিয়ামতের বড় না শুকরিয়া।

আখেরাতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করায় এবং আখেরাতের সংশোধনে বিবেক ব্যবহার করাই সঙ্গত। কারণ ইহার ফলে মহান অনুগ্রহশীলের হক আদায় হয় এবং বিবেকের মধ্যে নূরের সৃষ্টি হয়। সুতরাং মহান আল্লাহ পাকের দান বিবেককে পার্থিবতায় ব্যবহার করিবে না। পার্থিবতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, الدنيا جيفة। অর্থাৎ দুনিয়া গন্ধযুক্ত মৃতজন্তু।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যিহাক (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি আহার করিয়া থাক? তিনি বলিলেন, গোশত এবং দুধ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, অতঃপর তোমাদের আহারকৃত বস্তু কি হইয়া যায়? তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা কি হইয়া যায় তাহাতো আপনিও জানেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মানুষ থেকে যে মলমূত্র বাহির হয় উহাকে আল্লাহ পাক দুনিয়ার সাথে তুলনা দিয়া উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলিলেন, আল্লাহ পাকের কাছে দুনিয়ার মূল্য যদি মাছির একটি ডানার সমমূল্যেরও হইত তাহা হইলে তিনি কাফেরদের এক ঢোক পানিও পান করিতে দিতেন না।

সুতরাং যে ব্যক্তি স্বীয় বিবেককে দুনিয়ার ন্যায় এত দুর্গন্ধ ও নাপাক জিনিসের মধ্যে ব্যবহার করিয়াছে তাহার উদাহরণ এইরূপ যে এক বাদশাহ কোন এক ব্যক্তিকে স্বীয় তলোয়ার দান করিলেন যাহা খুবই সুন্দর, সুশোভিত এবং খুব মর্যাদাশীল। এইরূপ তলোয়ার শুধু তাহাকেই দান করিলেন। অন্য কাহাকেও দান করিলেন না। তাহাকে তলোয়ার দান করিবার উদ্দেশ্য ছিল সে যেন দুশমনদের হত্যা করে এবং ইহা কোমরে বাঁধিয়া নিজে সজ্জিত হয়। কিন্তু সে তলোয়ার হাতে লইয়া মৃতদেহের দিকে চলিল আর তলোয়ারের দ্বারা মৃত দেহগুলিকে কাটিতে শুরু করিল। আর এইভাবে তলোয়ারের ধার নষ্ট হইয়া গেল। ইহার ঔজ্জ্বলতা নষ্ট হইয়া গেল। বাদশাহ এই ঘটনা জানিতে পারিলেন। এখন তাহার হাত থেকে তলোয়ার ছিনাইয়া লওয়া এবং তাহাকে কৃতকর্মের শাস্তি দেওয়া উচিত। সে বাদশাহের সুদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া যাওয়ার

উপযুক্ত। উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে তদবীর (ব্যবস্থা অবলম্বন) দুই প্রকার। এক, প্রশংসনীয়। দুই, ঘৃণিত। যে ব্যবস্থা অবলম্বন তোমাকে আল্লাহ পাকের নিকটতর করিয়া দেয় তাহা হইল প্রশংসনীয়। যেমন, মাখলুকের হক থেকে মুক্তি লাভের জন্য অথবা ইহাদের হক আদায় করিবার জন্য অথবা মাফ করাইবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা। আল্লাহ পাকের কাছে তাওবা করা, অথবা এমন জিনিসের চিন্তাভাবনা করা যাহা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের মূলোৎপাটন করে। কেননা, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। অথবা প্রতারক ও প্রবঞ্চক শয়তান থেকে বাঁচিয়া থাকার চিন্তা-ফিকির করা। এইসবকিছু নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

এই জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন যে, সামান্য সময় চিন্তা ভাবনা করা সত্তর বৎসর ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম। দুনিয়াবী তদবীরও (ব্যবস্থা অবলম্বন) দুই প্রকার। এক, দুনিয়াবী ব্যবস্থা অবলম্বন করা দুনিয়ার জন্যই। দুই, দুনিয়াবী ব্যবস্থা অবলম্বন করা আখেরাতের জন্য। দুনিয়ার জন্য দুনিয়াবী ব্যবস্থা অবলম্বন করার অর্থ হইল, দুনিয়াবী জিনিসপত্র, অর্থ সম্পদ ও মালদৌলত সংগ্রহ করা। উদ্দেশ্য ইহার মাধ্যমে স্বীয় নামধাম ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি করা। এই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের দিকে যতই অগ্রসর হইবে ততই গাফলতি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ব্যবস্থা অবলম্বনকারী ধোকা খাইতে থাকিবে। ইহার নিদর্শন হইল, সে শরীয়তের আহকাম পালনে গাফেল হইয়া পড়িবে এবং নাফরমানী বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

আখেরাতের উদ্দেশ্যে দুনিয়াবী ব্যবস্থা অবলম্বন হইল- উদাহরন স্বরূপ কোন ব্যক্তি ব্যবসা-বানিজ্য ও কৃষিকার্য প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করিল এই নিয়তে যে, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দ্বারা হালাল রোযী আহার করিবে। ভুখা নাঙ্গাকে ইহার একাংশ দান করিবে এবং মানুষের সামনে নিজেদের মান-সম্মান রক্ষা করিবে।

যে ব্যক্তি আখেরাতের উদ্দেশ্যে দুনিয়া তলব করে তাহার পরিচয় হইল এই যে, সে অধিক উপার্জনে মনোনিবেশ করিবে না। সঞ্চয় করিবে না। মানুষের প্রয়োজন মিটাইতে সহযোগীতা করিতে থাকিবে। অভাবীদের প্রাধান্য দিবে।

পার্থিবতা বর্জনকারীর নির্দশন দুইটি। তাহার এক নিদর্শন প্রকাশ পাইবে দুনিয়া লাভ না হওয়ার সময়। দ্বিতীয় নিদর্শন প্রকাশ পাইবে পার্থিব ধন সম্পদ অর্জিত হওয়ার সময়। পার্থিব ধন সম্পদ লাভ হওয়ার সময় তাহার নিদর্শন হইল যে, সে যাহা লাভ করিয়াছে তাহা হইতে অভাবীদের দান করিবে।

তাহাদের প্রয়োজন মিটাইবে। আর পার্থিব ধন সম্পদ লাভ না হওয়ার সময় তাহার নিদর্শন হইল যে, সে ব্যতিব্যস্ত বা অস্থির হইবে না। সুতরাং অভাবীদের দান করা তাহাদের উদ্দেশ্যে সম্পদ কুরবান করাতো সম্পদ লাভ করার নিয়ামতের শুকরিয়া। আর অস্থির না হওয়া সম্পদ না থাকার নিয়ামতের শুকরিয়া।

বিষয়টি এমন ব্যক্তি বুঝিতে পারে যাহার অনুধাবণ ক্ষমতা এবং এই বিষয় সম্পর্কে পরিচয় রহিয়াছে। কেননা, পার্থিব ধন সম্পদ লাভ করা যেমন আল্লাহর নিয়ামত তেমনিভাবে আল্লাহ পাক বান্দাকে ধন সম্পদ প্রদান না করাও এক প্রকার নিয়ামত। বরং শেষোক্ত নিয়ামত প্রথমোক্ত নিয়ামত অপেক্ষা অধিক পরিপূর্ণ।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক দুনিয়াতে যে সকল জিনিস আমাকে দান করিয়াছেন তাহাতে যে নিয়ামত রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক নিয়ামত রহিয়াছে ঐ সকল জিনিসে যাহা আমার থেকে দূরে রাখিয়াছেন।

হযরত আবুল হাসান শাযলী (রহঃ) বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)কে দেখিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, কোন সংবাদ আছে কি? অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত বাহির হওয়ার নিদর্শন কি? আমি বলিলাম যে আমি জানি না। তিনি বলিলেন, অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত বাহির হওয়ার নিদর্শন হইল এই যে, দুনিয়ার ধন সম্পদ হস্তগত হইলে তাহা হইতে ব্যয় করে আর হস্তগত না হইলে স্বস্তিরতার সাথে বসিয়া থাকে। অস্থির হয় না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে- সর্ব প্রকার দুনিয়া তলবকারী ঘৃণিত নয়। বরং ঘৃণিত ঐ ব্যক্তি যে নিজের জন্য দুনিয়া তলব করে। স্বীয় প্রভুর জন্য তলব করে না। দুনিয়ার জন্যই দুনিয়া তলব করে আখেরাতের উদ্দেশ্যে তলব করে না।

সুতরাং মানুষও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক, শ্রেণী যাহারা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে দুনিয়া তলব করে। দ্বিতীয় শ্রেণী যাহারা আখেরাতের উদ্দেশ্যে দুনিয়া তলব করে।

প্রাথমিক পর্যায়ের এক সুফী বিত্তশালী এক কামেল সুফীকে বলিল, যে দুনিয়ার সাথে মহব্বত রাখে সে কাপুরুষ। কামেল সুফী জবাব দিল যে, যদি দুনিয়ার সাথে মহব্বত রাখে তাহা হইলে বন্ধুর উদ্দেশ্যেই দুনিয়ার মহব্বত রাখে।

আমি শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আরিফ (আল্লাহর পরিচয় প্রাপ্ত ব্যক্তি) পার্থিব ধন সম্পদ জমা করিয়া রাখে না। কেননা তাঁহার পার্থিব ধন সম্পদ হয় আখেরাতের জন্য। আর তাহার আখেরাত হয় তাহার রবের জন্য। সুতরাং সাহাবা ও সলফে সালেহীনের দুনিয়ার আসবাব অবলম্বন করারও একই উদ্দেশ্য ছিল। ইহাদের দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং তাহার সন্তুষ্টি অর্জনের সরঞ্জাম প্রস্তুত করা। দুনিয়া এবং দুনিয়ার রং-রূপ উদ্দেশ্য ছিল না। আল্লাহ পাক তাহাদের এই গুণের কথা কুরআনে পাকে উল্লেখ করিয়াছেন-

محمد رسول الله و الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا * سيماهم في وجوههم من اثر السجود *

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এবং যাহারা তাঁহার সাথে আছে তাহারা কাফেরদের মোকাবিলায় খুব সুদৃঢ় এবং নিজেদের মধ্যে একে অপরের প্রতি মেহেরবান ও দয়ালু। আপনি তাহাদিগকে দেখিবেন যে, তাহারা রুকু সিজদা করে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি তালাশ করে। তাহাদের নিদর্শন হইল তাহাদের মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাব রহিয়াছে।

অন্য এক স্থানে আল্লাহ পাক বলেন-

في بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو و الاصال * رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و الابصار *

আল্লাহ পাকের নূর এই সকল ঘরের মধ্যে রহিয়াছে। আল্লাহ পাক হুকুম করিয়াছেন ইহাদের উচ্চ করিবার জন্য আর ইহাতে আল্লাহ পাকের নাম যিকির করার জন্য এবং এই সকল ঘরে সকাল সন্ধ্যা এমন সব লোক আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করে যাহাদিগকে কোনরূপ ব্যবসা বানিজ্য ও লেনদেন আল্লাহর যিকর করা, নামায কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা থেকে গাফেল করিতে পারে না। তাহারা এমন দিনকে ভয় করে যেদিনে অন্তর ও দৃষ্টি পরিবর্তন হইয়া যাইবে।

তিনি অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا *

তাহারা আল্লাহ পাকের কাছে যাহা কিছু ওয়াদা করিয়াছিল তাহা সত্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে এমন রহিয়াছে যাহারা স্বীয় মান্নত পুরা করিয়াছে। আর অনেকে অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা নিজেদের ওয়াদাতে কোনরূপ পরিবর্তন করে নাই। এই বিষয়ে উল্লেখিত আয়াতসমূহের অনুরূপ আরও অনেক আয়াত রহিয়াছে।

আর এই শ্রেণীর লোকেরাই উল্লেখিত গুণাবলীর অধিকারী হইতে পারে। কেননা আল্লাহ পাক তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংশ্রব লাভের জন্য এবং কুরআনের বাহক হওয়ার জন্য পছন্দ করিয়াছেন। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এমন কোন মুসলমান আসবে না যাহার প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ন্যায় অগণিত এবং স্বরণযোগ্য অনুগ্রহ হইতে পারে। কেননা তাহারা এমন সব লোক যাহারা হেকমত এবং আহকামসমূহ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন। হালাল-হারামের পরিচয় বর্ণনা করিয়াছেন। আহকামের ব্যাপকতা ও বিশেষতা অনুধাবন করিয়াছেন। বিভিন্ন মুলক ও এলাকা জয় করিয়াছেন। মুশরিক ও উদ্ধতদের অধীনস্থ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য ও বাস্তব। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, আমার সাহাবী নক্ষত্র সদৃশ। তাহাদের যে কোন এক জনের অনুসরণ করিবে হেদায়েত পাইয়া যাইবে। আল্লাহ পাক এখানে প্রথমোল্লেখিত আয়াতে তাহাদের অনেক গুনাবলীর কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এমনকি বলিয়াছেন-

يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا *

তাহারা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি তালাশ করে। আল্লাহ পাক তাহাদের অন্তরের সর্বপ্রকার অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তিনি তাহার ভিতর বাহির পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখেন। তিনি তাহাদের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, দুনিয়া তালাশ তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভ ব্যতীত তাহাদের দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আল্লাহ পাক তাহাদের সম্পর্কে বলেন,

وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ *

আপনি ঐ সব লোকদের সাথে জমিয়া বসিয়া পড়ুন যাহারা সকাল সন্ধ্যা স্বীয় প্রভুকে আহবান করে তাঁহার সন্তুষ্টির ইচ্ছায়। অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক

পরিস্কারভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে আল্লাহ পাক ব্যতীত তাহাদের কোন ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য নাই। অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন, এই সব ঘরের মধ্যে সকাল সন্ধ্যা এমন সব লোক আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে যাহাদিগকে ব্যবসা-বানিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্বরণ থেকে ফিরাইতে পারে না। অত্র আয়াতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, তাহাদের অন্তর পবিত্র হইয়া গিয়াছে। তাহাদের নূর পরিপূর্ন হইয়া গিয়াছে। এই জন্য দুনিয়া তাহাদের অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাহাদের ঈমানের চেহারার উপর কোন দাগ কাটিতে পারে নাই। যে সব অন্তর আল্লাহর প্রেমে কানায় কানায় ভরপুর এবং আল্লাহর নৈকট্যের নূরে আলোকিত এমন অন্তরে দুনিয়া কিভাবে প্রবেশ করিতে পারে?

আল্লাহ পাক বলেন-

ان عبادى ليس لك عليهم سلطان *

নিশ্চয়ই আমার খাছ বান্দাদের উপর তোর কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ চলিবে না। যদি তাহাদের অন্তরের উপর দুনিয়ার প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে তাহাদের অন্তরের উপর শয়তানেরও নিয়ন্ত্রণ চলিত। কেননা যে সব অন্তর পার্থিবতা বর্জনের নূর দ্বারা আলোকিত এবং পার্থিবতা প্রেমের ময়লা আবর্জনা থেকে মুক্ত শয়তানের প্রভাব ঐ সব অন্তর স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং

ان عبادى ليس لك عليهم سلطان *

আয়াতের সারকথা হইল হে শয়তান! আমার খাছ বান্দাদের উপর তোর কোন নিয়ন্ত্রণ চলিবে না এবং অন্য কোন মাখলুকেরও চলিবে না। কেননা তাহারা আমার বড়ত্বের প্রাধান্য ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রাধান্য অন্তরে আসিতে দেয় না। সুতরাং উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ পাক তাহাদের একটি গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, কোনরূপ ব্যবসা-বানিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় তাহাদিগকে আল্লাহর স্বরণ হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারে না। এই কথা বলেন নাই যে, তাহারা ব্যবসা-বানিজ্য ও বেচা-কেনা করিতেন না। বরং এই আয়াতের মূল বিষয়বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, ব্যবসা-বানিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। উল্লেখিত আয়াতে তাহাদের গুণাবলী বর্ণনা করিতে গিয়া اقام الصلوة و ايتاء الزكوة এই বিষয়দ্বয়ও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বিত্তশালী হওয়া নিষিদ্ধ নয়। কেননা বিত্তশালী হওয়া নিষেধ করা যদি উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে যে কাজ করিলে বিত্তশালী হওয়া যায় তাহা করাও নিষেধ করিতেন।

উদাহরণস্বরূপ ব্যবসা বানিজ্য ও বেচাকেনা করা নিষেধ করিতেন। লক্ষ্য কর ايتاء الزكوة (যাকাত আদায় করা) এখানে প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। আর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং এখান থেকে পরিস্কার ভাবে বুঝা যায় যে উল্লেখিত গুণাবলীর ধারকগণের মধ্যে কেহ কেহ বিত্তশালীও ছিলেন। এতদ্বসত্ত্বেও তাহারা প্রশংসার যোগ্য রহিয়াছেন যখন তাহারা স্বীয় প্রভুর হক আদায় করিয়াছেন।

কয়েকজন বিত্তশালী সাহাবার (রাঃ) অবস্থার বিবরণ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওতবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান (রাঃ) যে দিবসে শহীদ হইয়াছেন সে দিবসে তাহার সম্পদের কোষাধ্যাক্ষের কাছে নগদ অর্থ ছিল দেড়লক্ষ দিনার আর দশ লক্ষ দেরহাম। আরিস ও খায়বর এবং ওয়াদিউল কুরা নামক স্থান ত্রয়ের মধ্যস্থলে তাহার কিছু জমি ছিল। ইহার মূল্য ছিল দুই লক্ষ দিনার।

হযরত যুবায়র (রাঃ)-এর পরিত্যক্ত সম্পদের এক অষ্টমাংশের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার দিনার। এই হিসাবে তাহার পরিত্যক্ত সম্পদের মোট মূল্য ছিল চার লক্ষ দিনার। অধিকন্তু এক হাজার অশ্ব এবং এক হাযার গোলামও তাহার পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে ছিল। হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) মৃত্যুর সময় নগদ তিন লক্ষ দিনার ছাড়িয়া গিয়াছেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) খ্যাতিমান বিত্তশালী ছিলেন। ইহাতো সকলেই জানে। দুনিয়া এই সকল মহাপুরুষদের হাতের মধ্যে ছিল, অন্তরের মধ্যে ছিল না। যখন পার্থিব সম্পদ হাতে থাকিত না তখন সবর করিতেন। আর যখন হাতে আসিত শুকরিয়া আদায় করিতেন। আল্লাহ পাক প্রথম প্রথম তাহাদিগকে অভাব-অনটনে ডুবাইয়া রাখেন। ফলে তাহারা আন্তরিকভাবে পরিপূর্ণ নূর লাভ করেন এবং তাহাদের অন্তর পবিত্র হইয়া যায়। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে পার্থিব সম্পদ দান করেন। কেননা যদি প্রথমেই তাহারা সম্পদের অধিকারী হইয়া পড়িতেন। তাহা হইলে হয়তবা সম্পদ তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিত। যেহেতু তাহাদের মধ্যে একীন বদ্ধমূল ও স্থায়ী হইয়া যাওয়ার পর তাহারা সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন তাই তাহারা নিজস্ব সম্পদের ক্ষেত্রেও আমানতদার কোষাধ্যাক্ষের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন। আর আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত নির্দেশ মোতাবেক আমল করিয়াছেন

وَ اَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ *

তোমরা ঐ সকল সম্পদ থেকে খরচ কর যাহাতে আল্লাহ পাক তোমাদিগকে খলীফা (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করিয়াছেন।

সারকথা- তাহারা নিজস্ব সম্পদ মালিকের ন্যায় খরচ করিতেন না বরং মালিকের চাকরের ন্যায় খরচ করিতেন।

আল্লাহ পাক মুসলমানদিগকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে প্রথম প্রথম কেন নিষেধ করিয়াছিলেন তাহা এখান থেকে বুঝা যায়। জিহাদ নিষেধ করিয়া আল্লাহ পাক বলেন,

وَ اعْفُوْا وَ اصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ *

মাফ কর এবং ক্ষমা করিতে থাক। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক স্বীয় নির্দেশ প্রেরণ না করেন।

ইহার কারণ এই যে, যদি ইসলামের সূচনা যুগেই জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হইত তাহা হইলে হয়তাবা মুজাহিদগণ জিহাদে ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হইয়া কাফেরদের হত্যা করিতেন আর নিজেদের খারাপ নিয়তের খোঁজও পাইতেন না। হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি কাফেরদের এক আঘাত করার পর কিছুক্ষন বিলম্ব করিয়া দ্বিতীয় আঘাত করিতেন। কেননা সাথে সাথে একের পর এক আঘাত করিতে থাকিলে জিহাদে স্বীয় প্রবৃত্তির দখলের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। তিনি এই ভয়ে এইরূপ করিতেন। তাঁহার এইরূপ করার কারণ ইহা ছিল না যে, তিনি নফসের লুকায়িত ধোকাসমূহ কি কি তাহা জানিতেন। সাহাবাগণ সর্বদা নিজেদের অন্তরের হেফাজত করিতেন। নিজেদের আমল বিশুদ্ধ ও খালেছ করিবার চেষ্টা করিতেন। আর সর্বদা এই ভয় করিতেন যে না জানি তাহাদের আমলের মধ্যে এমন কোন জিনিস মিশ্রিত হইয়া যায় যাহা আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হওয়ার পথে অন্তরায় হয়। সুতরাং পার্থিবতা সাহাবাদের হাতে ছিল অন্তরে ছিল না। ইহার প্রমাণ এই যে, সাহাবাগণ দুনিয়া হইতে পৃথক থাকিতেন এবং অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দিতেন। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনে ঘোষণা করেন-

يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ *

তাহারা অন্যদিগকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয় যদিও ক্ষুধায় জর্জরিত থাকে। এই সম্পর্কে তাহাদের এক ঘটনা হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন এক সাহাবীর ঘরে হাদিয়া স্বরূপ ছাগলের একটি মাথা আসিল। তিনি মনে মনে বলিলেন যে, অমুক ব্যক্তি তো আমার অপেক্ষা অধিক হকদার। তখন তিনি অন্য

এক ঘরের নাম বলিয়া দিলেন যে, ঐ ঘরের লোক আমার অপেক্ষা অধিক মুখাপেক্ষী সেখানে লইয়া যাও। অন্য ঘরে লইয়া যাওয়ার পর সে ঘরওয়ালারা অন্য আর এক ঘরের নাম বলিয়া দিল। এইভাবে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে ঘুরিতে ঘুরিতে সাত আট ঘর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার প্রথম ঘরেই আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ দলীল হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘটনা। তিনি এক জিহাদে স্বীয় সম্পদের অর্ধাংশ আর হযরত আবু বকর (রাঃ) স্বীয় সমুদয় সম্পদই দান করিয়াছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) যুদ্ধের সরঞ্জাম ও রসদ বোঝাই সাতশত উট দান করিয়াছিলেন। আর হযরত উসমান (রাঃ) তবুকের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সমস্ত খরচ বহন করিয়াছিলেন। অনুরূপ অনেক ভাল ভাল কাজ এবং প্রশংসনীয় অবস্থার কথা তাহাদের সম্বন্ধে বর্ণিত আছে। আল্লাহ পাক তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন-

رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ *

তাহারা এমন সব লোক যাহারা আল্লাহ পাকের কাছে প্রদত্ত ওয়াদা সত্য করিয়া দেখাইয়াছেন। অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক তাহাদের অন্তরে লুকায়িত সত্যতার খবর দিয়াছেন। সুতরাং ইহা তাহাদের জন্য খুব বড় প্রশংসা এবং গৌরবের কথা। কেননা, বাহ্যিক কর্ম সম্পর্কে মাখলুকের বাহ্যিক জ্ঞান সন্দেহযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কিন্তু তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক যে সংবাদ দিয়াছেন তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং এই সকল আয়াতে তাহাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিন অবস্থার পবিত্রতা ও সাফায়ী বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের প্রশংসা ও গৌরব প্রমাণিত হইতেছে। ইহা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তদবীর (ব্যবস্থা অবলম্বন) দুই প্রকার। এক প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন যাহা দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই দুনিয়াবী ব্যবস্থা। যেমন বর্তমান যুগে দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা গৃহীত ব্যবস্থা। দ্বিতীয় আখেরাতের উদ্দেশ্যে দুনিয়াবী ব্যবস্থা অবলম্বন। যেমন সাহাবায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীনদের অবস্থা। ইহার দলীল হিসাবে হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইরশাদ পেশ করা যায়। তিনি ইরশাদ করেন যে, আমি নামাযের মধ্যে সৈন্যবাহিনীর আসবাবপত্র ঠিক করি। হযরত ওমর (রাঃ) আল্লাহ পাককে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করা অবস্থায় এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কাম আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হইয়াছিল। এ জন্য তাহার নামাযও ফাসেদ হয় নাই; এমনকি নামাযের পরিপূর্ণতায়ও কোন ক্ষতি হয় নাই।

এক প্রশ্ন ও উহার উত্তর

যদি কেহ আপত্তি উত্থাপন করে যে, তোমাদের দাবী তো হইল যে, সাহাবাদের কেহই দুনিয়ার পিছনে পড়েন নাই। তাহারা পার্থিবতা অনুসন্ধানী ছিলেন না। অথচ ওহুদের যুদ্ধে সংঘটিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক তাহাদের সম্পর্কে বলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ দুনিয়া চাহিতেছিলে আর কেহ কেহ আখেরাতের অনুসন্ধানী ছিলে। এমন কি কোন কোন সাহাবা বলেন, নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হওয়া পর্যন্ত আমরা বুঝিতে পারিতেছিলাম না যে আমাদের মধ্যে দুনিয়ার ইচ্ছা পোষণকারী আছে। আয়াতটি এই যে-

مِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ *

তোমাদের মধ্যে কতক দুনিয়ার ইচ্ছা পোষণ করিতেছ আর কতক আখেরাত চাহিতেছ।

সুতরাং তাহাদের মধ্যে কেহই দুনিয়ার ইচ্ছা করে নাই এমন কথা বলা কিভাবে সহীহ হইতে পারে?

এই আপত্তির সমাধান শুনার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটি কথা বুঝিয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহা হইল এই যে, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভাল ধারণা রাখা প্রতি মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। অনুরূপভাবে তাহাদের উচ্চ মর্যাদা মনে প্রাণে স্বীকার করা এবং তাহাদের সমুদয় উক্তি, বক্তব্য, কাজকর্ম এবং অবস্থা প্রভৃতি উত্তম অর্থে প্রয়োগ করা অপরিহার্য কর্তব্য। এই সব বিষয় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশার সাথে সম্পর্কিত হউক বা তাহার ওফাতের পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পর্কিত হউক। ইহার দলীল এই যে, আল্লাহ পাক যখন তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পবিত্রতা বর্ণনা করিয়াছেন তখন ইহা কোন যুগ বা কালের সাথে সীমাবদ্ধ করেন নাই। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী 'আমার সাহাবী নক্ষত্রের ন্যায়।' তাহাদের যে কোন একজনকে অনুসরণ কর হেদায়েত পাইয়া যাইবে। ইহাও কোন কালের সাথে সম্পর্কিত না করিয়া ব্যাপক রাখিয়াছেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁহার ওফাতের পর উভয় সময়ে তাহাদের থেকে যে সব উক্তি, বক্তব্য, কাজকর্ম এবং অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে এইগুলিকে উত্তম অর্থে প্রয়োগ করা অপরিহার্য কর্তব্য। এখন উল্লেখিত আপত্তির সমাধান শুন। ইহার সমাধান দুইভাবে পেশ করা যাইতে পারে।

এক ঃ তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ দুনিয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলে ইহার অর্থ তোমারা আখেরাতের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলে। অর্থাৎ এই সকল লোক গনিমতের মাল অর্জনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাল অর্জনের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল আখেরাত। কেননা এই মাল খরচ করিয়া এবং দান করিয়া নেক আমল অর্জন করা ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। তাহাদের দুনিয়ার ইচ্ছা করার এই অর্থ। নিছক দুনিয়ার উদ্দেশ্যে দুনিয়া নয়। আর কতক সাহাবা ছিলেন যাহাদের ইহাও উদ্দেশ্য ছিল না। তাহারা শুধু জিহাদের মর্যাদা অর্জন করাকেই যথেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন। গনীমতের মালের দিকে ফিরিয়াও দেখেন নাই এবং মনোযোগও দেন নাই। সুতরাং তাহাদের কতকজন ছিলেন মর্যাদাবান ও পরিপূর্ণ। আর কতক ছিলেন তাহাদের অপেক্ষাও অধিক মর্যাদাবান ও অধিক পরিপূর্ণ। কেহই অসম্পূর্ণ ছিলেন না।

দুই ঃ মনিব স্বীয় খাছ গোলামকে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন। কিন্তু ঐ গোলামের সাথে আদবের সহিত আচরণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। কেননা মনিবের সাথে তাহার বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। মনিব স্বীয় গোলামকে যাহা বলিবেন আমরাও তাহাকে তাহাই বলিব এমন হইতে পারে না। কেননা মনিব গোলামকে যাহা ইচ্ছা বলিবেন যাহাতে মনিবের খেদমতে গোলামের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। আর তাহার সাহস এবং ইচ্ছায় উন্নতি হয়। কিন্তু আমরা গোলামকে কিছু বলিতে হইলে তাহার প্রতি আদবের খেয়াল করিয়া বলিতে হইবে। কুরআন অনুসন্ধান করিলে অনুরূপ অনেক ঘটনা চোখে পড়িবে। উদাহরণ স্বরূপ সূরায়ে 'আবাসা'তে উল্লেখিত বিষয়বস্তু। এমনকি হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ কোন বিষয় গোপন করিতে চাহিতেন তাহা হইলে সূরায়ে 'আবাসা'কে অবশ্যই গোপন করিয়া ফেলিতেন।

মোটকথা, উপরের আলোচনা দ্বারা সাব্যস্ত হইল যে, ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করার অর্থ এই নহে যে, সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও আখেরাত উদ্দেশ্য হইলেও পার্থিব মাধ্যম ব্যবহার করা যাইবে না। বরং যে ব্যবস্থা অবলম্বন নিষিদ্ধ তাহা হইল পার্থিবতা লাভের উদ্দেশ্যে পার্থিব মাধ্যম গ্রহণ করা। নিষিদ্ধ ব্যবস্থা অবলম্বন করার নিদর্শন এই যে এই ব্যবস্থা নাফরমানীর সহায়ক হিসাবে প্রকাশ পাইবে এবং হালাল হারামের প্রতি খেয়াল না রাখিয়া কার্যসম্পাদন করিবে। কোন জিনিস প্রশংসনীয় বা ঘৃণিত হওয়া উক্ত জিনিসের ফলাফলের ভিত্তিতে বিবেচিত হয়। যদি ইহার ফল ভাল হয় তাহা

হইলে জিনিসটি প্রশংসনীয়। আর যদি ইহার ফল খারাপ হয় তাহা হইলে জিনিসটি ঘৃণিত। সুতরাং ঘৃণিত ব্যবস্থা হইল যাহা অবলম্বন করার ফলে বান্দা আল্লাহ পাক সম্পর্কে গাফেল হইয়া পড়ে। মনিবের খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার ক্ষেত্রে শিথিল হইয়া পড়ে এবং তাহার নির্দেশ পালনে বিরত থাকে। আর প্রশংসিত ব্যবস্থা অবলম্বন তদ্রূপ নয়। বরং ইহা বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য প্রদান করে এবং তাঁহার সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছায়। অনুরূপভাবে পার্থিবতা মূলতঃ প্রশংসিতও নয় আবার ঘৃনিতও নয়। বরং ঘৃণিত পার্থিবতা হইল যাহা বান্দাকে মনিব হইতে গাফেল করিয়া দেয় এবং আখেরাতের পাথেয় উপার্জনে বিরত রাখে। যেমন কোন কোন আরেফ বলেন যে, তোমাকে যাহা আল্লাহ থেকে গাফেল করিয়া রাখে তাহা তোমার জন্য অশুভ জিনিস। যদিও তাহা তোমার স্ত্রী হয় বা ধন সম্পদ হয় বা তোমার সন্তানাদি হয়।

প্রশংসিত পার্থিবতা হইল যাহা তোমার জন্য আল্লাহ পাকের আনুগত্যে সহায়ক হয় এবং তোমাকে মনিবের খেদমতের উদ্দেশ্যে উৎসাহী এবং যোগ্য করিয়া তোলে। মোটকথা যাহা ভাল কাজের মাধ্যম হয় তাহাই প্রশংসিত। আর যাহা খারাপ কার্যের মাধ্যম হয় তাহা ঘৃণিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, দুনিয়া দুর্গন্ধযুক্ত একটি মৃত পশুর তুল্য। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, দুনিয়া অভিশপ্ত। আর দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে তাহাও অভিশপ্ত। তবে আল্লাহর যিক্র আর যে সব জিনিস উহার সাথে সম্পর্কিত এবং আলেম ও ইলমে দ্বীনের অন্বেষণকারী। তাহারা অভিশপ্ত নয়।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক দুনিয়াকে মানবের নির্গত মলের সাথে উদাহরণ দিয়াছেন। এই সকল হাদীছের চাহিদা এই যে, দুনিয়া ঘৃনিত এবং মানুষও যেন ইহা ঘৃণা করে। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দুনিয়াকে গালি দিও না। ইহা ঈমানদারের জন্য খুব ভাল বাহন। ইহাতে আরোহন করিয়া কল্যাণ অনুসন্ধান করিতে পারে এবং অকল্যাণ হইতে বাঁচিতে পারে। এর মধ্যে সামস্য হইল যে, দুনিয়াকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশপ্ত বলিয়াছেন। তাহা হইল যেই দুনিয়া বান্দাকে আল্লাহ হইতে গাফেল করিয়া দেয়। এই জন্যই তিনি দুনিয়াকে অভিশপ্ত বলিয়া সাথে সাথে ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে "কিন্তু আল্লাহ পাকের যিক্‌র আর যে সব জিনিস ইহার সাথে সম্পর্কিত এবং আলেম ও ইলমে দ্বীন অন্বেষণকারী" অর্থাৎ এইগুলি অভিশপ্ত

দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নহে। পক্ষান্তরে যেই দুনিয়া সম্পর্কে বলিয়াছেন যে দুনিয়াকে গালি দিও না। ইহা ঐ দুনিয়া যাহা তোমাকে আল্লাহর আনুগত্য পর্যন্ত পৌঁছায়। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ইহা ঈমানদারের জন্য খুব ভাল বাহন। সুতরাং বাহন হিসাবে ইহার প্রশংসা করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইহা ধোকাবাজি ও গোনাহের স্থান। এই হিসাবে ইহার ঘৃণা করা হইয়াছে। সুতরাং এখান থেকে তুমি অনুধাবন করিতে পরিয়াছ যে, ব্যবস্থা অবলম্বন পরিত্যাগ করার এই অর্থ নহে যে যে কোন মাধ্যম গ্রহণ করা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরাইয়া লইতে হইবে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে মানুষ ধ্বংস হইতে থাকিবে এবং অন্যের উপর বোঝা হইয়া যাইবে এবং মাধ্যম, ওসিলা প্রভৃতির ভিতর আল্লাহ পাকের যে হেকমত রহিয়াছে সে সম্পর্কে মানুষ অজ্ঞ থাকিবে। ইহা কখনও উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা একজন ইবাদতকারীর নিকট দিয়া কোথাও যাইতেছিলেন। তিনি এই ইবাদতকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কোথায় থেকে খানাপিনা কর? সে বলিল যে, আমার ভ্রাতা আমার কাছে খাদ্য প্রেরণ করেন। তিনি বলিলেন, তোমার ভ্রাতা তোমার চেয়ে অধিক ইবাদতকারী। অর্থাৎ তোমার ভ্রাতা বাজারে থাকা সত্ত্বেও তোমার চেয়ে বেশী ইবাদতকারী। কেননা সে তো ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমার সাহায্যকারী। ইবাদতের জন্য তোমাকে সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

সারকথা- আসবাব (উপায়) অবলম্বন করা কিভাবে অস্বীকার করা যাইতে পারে? অথচ কুরআনে উল্লিখিত হইয়াছে- احل الله البيع و حرم الربوا আল্লাহ পাক বেচাকেনা হালাল করিয়াছেন আর সুদ হারাম করিয়াছেন।

অন্য এক স্থানে উল্লেখিত হইয়াছে- و اشهدوا اذا تبايعتم যখন তোমরা বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী নির্ধারিত করিয়া লও।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষ যে সকল আহার্য বস্তু খায় তন্মধ্যে সর্বাধিক হালাল যাহা মানুষ নিজ হাতে উপার্জন করে।

হযরত দাউদ (আঃ) নিজ হাতের কামাই খাইতেন। তিনি আরও বলেন, ধোকাবাজি না করিয়া নিজ হাতে যাহা কামাই করে তাহা সবচেয়ে ভাল কামাই। অন্য এক হাদীছে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, যে মুসলমান ব্যবসায়ী আমানতদার, সত্যবাদী সে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে থাকিবে।

এই সকল আয়াত ও হাদীছ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে সর্বপ্রকার

আসবাবকে (উপায়) কিভাবে অস্বীকার করা যায়? তবে যাহা বান্দাকে আল্লাহ থেকে গাফেল করিয়া দেয় এবং তাঁহার আহকাম পালনে বিরত রাখে তাহা অবশ্যই ঘৃনিত। এমনকি যদি কেহ সর্বপ্রকার আসবাব থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকে। পার্থিব কোন মাধ্যমই গ্রহণ না করে। ইহার পরও আল্লাহ থেকে গাফেল থাকে ইহাও ঘৃনিত।

উপায় অবলম্বনকারী ও উপায় বর্জনকারীর বিপদাপদ

বিপদাপদ শুধু উপায় অবলম্বনকারীর উপরই আসে না বরং উপায় পরিত্যাগকারীর উপরও পতিত হয়। কিন্তু আল্লাহ পাকের ক্রোধ হইতে ঐ ব্যক্তিই বাঁচিতে পারে যাহার প্রতি তাঁহার মেহেরবানী হয়। বরং কখনও কখনও উপায় পরিত্যাগকারীর প্রতি অপেক্ষাকৃত কঠিন বিপদ আপতিত হইয়া থাকে। কেননা, উপায় অবলম্বনকারীর প্রতি আপতিত বিপদ তো ইহা যে সে পার্থিবতায় প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু সে নিজেদের ভিতর বাহির এক রকম বলিয়া দাবী করে না। নিজের দুর্বলতা ও অপরাধ স্বীকার করে। যাহারা পার্থিবতা থেকে পৃথক হইয়া ইবাদতে লাগিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে নিজের অপেক্ষা উত্তম মনে কর। উপায় পরিত্যাগকারীর বিপদ হইল তাহার মধ্যে আত্মগর্ব জন্ম লওয়া, লৌকিকতা, বানোয়াট অথবা মাখলুকের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা যাহাতে তাহাদের থেকে সম্পদ ও অর্থ বাগাইয়া লইতে পারে। কখনও কখনও তাহার প্রতি আপতিত বিপদ এমনও হয় যে, সে মাখলুক নির্ভর হইয়া পড়ে। ইহার নিদর্শন এই যে, যদি মানুষ তাহাকে সম্মান না করে তাহা হইলে সে তাহাদের দুর্নাম করিতে থাকে। তাহাদিগকে সুদৃষ্টিতে দেখে না। যদি তাহার সেবা না করে তাহা হইলে তাহাদের প্রতি নাখোশ হইয়া পড়ে। সুতরাং যে ব্যক্তি গাফেল অবস্থায় পার্থিব উপায় অবলম্বনে নিমজ্জিত হইয়াছে তাহার অবস্থা উল্লেখিত উপায় পরিত্যাগকারীর অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল।

আল্লাহ পাক আমাদের নিয়ত দুরস্ত করিয়াছেন এবং স্বীয় অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে আমাদিগকে এই সকল বিপদাপদ হইতে দূরে রাখেন।

অনুচ্ছেদ ঃ আমাদের আলোচনা থেকে তুমি হয়তবা বুঝিয়া লইয়াছ যে উপায় অবলম্বনকারী আর উপায় বর্জনকারী সমপর্যায়ভুক্ত। তোমার এইরূপ বুঝার ভিত্তি হয়তবা ইহা যে উভয়ের প্রতি বিপদ আপতিত হয় আর চেষ্টা করিলে উভয়ে ইহা হইতে বাঁচিয়াও থাকিতে পারে। সুতরাং উভয় পক্ষ সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু তোমার এই ধারনা সহীহ নহে। কারণ প্রকৃত বিষয়টি এইরূপ নয়। যে ব্যক্তি নিজকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে এবং

স্বীয় ওয়াক্ত তাঁহার ইবাদতে নিয়োজিত করিয়াছে আল্লাহ পাক কখনও এই ব্যক্তিকে পার্থিব উপায়ে নিমজ্জিত ব্যক্তির সমকক্ষ করিবেন না। যদিও তাহার মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকে। সুতরাং উপায় অবলম্বনকারী আর উপায় বর্জনকারী উভয়ে যদি আল্লাহর মারেফাত অর্জনে একই পর্যায়ের হইয়া থাকে তবুও উপায় বর্জনকারী উত্তম।

এক বুযুর্গ উপায় অবলম্বনকারী আর উপায় বর্জনকারীর উদাহরণ এইভাবে পেশ করিয়াছেন যে যেন তাহারা এক বাদশাহের দুই গোলাম। বাদশাহ এক গোলামকে বলিলেন যে, তুমি উপার্জন কর আর উপার্জনের অর্থে জীবিকা নির্বাহ কর। দ্বিতীয় গোলামকে বলিলেন যে, তুমি আমার দরবারে থাকিয়া আমার খেদমত কর। আমি তোমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করিব। নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় গোলামের মর্যাদা মনিবের কাছে অনেক বেশী। তাহার সাথে মনিবের এইরূপ আচরণ তাহার প্রতি মনিবের বিশেষ অনুগ্রহের প্রমাণ। অধিকন্তু পার্থিব উপায় অবলম্বন করার পর নাফরমানী হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল ইবাদত নসীব হওয়া বড়ই দুষ্কর ও দুরূহ। কেননা ইহাতে বিভিন্ন প্রকার লোকের সাথে সময় কাটাইতে হয় এবং অসতর্ক ও উদ্ধত লোকদের সাথে মিলামিশা করিতে হয়। কেননা ইবাদতকারীদের দর্শন ইবাদতের জন্য বড় সাহায্যকারী এবং গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ গোনাহের বড় কারণ হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মানুষ স্বীয় বন্ধুর দ্বীনের উপর চলে। সুতরাং চিন্তা করিয়া বন্ধুত্ব করিও। কোন এক কবি এই বিষয়ে একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন। কবিতাটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল-

☆ মানুষকে জিজ্ঞাসা করিও না কিন্তু তাহার বন্ধুকে দেখ।

☆ কেননা বন্ধু বন্ধুর অনুসারী হয়।

☆ যাহার মধ্যে দোষ ও খারাপী রহিয়াছে তাহার থেকে তাড়াতাড়ি পৃথক হইয়া পড়।

☆ মিলিয়া মিশিয়া কল্যানাবলম্বী হও। খারাপ হইও না।

নফসের (আত্মার) এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যে, যাহার সাথে মিলিত হয় উহার অনুরূপ গ্রহণ করে। উহার অনুকরণ করে। উহার গুণে গুণান্বিত হয় এবং উহার সাদৃশ্য হয়।

গাফেলদের সংশ্রব নফসের গাফলতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। কেননা নফসের মধ্যে জন্মগতভাবে গাফলতি বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং গাফলতি

বৃদ্ধির কোন কারণ অর্থাৎ গাফেলদের সংশ্রব যখন নফসের সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন নফসের কি অবস্থা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। হে ভ্রাতা! তুমি নিজের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ যখন তুমি ঘর হইতে বাহির হও আর যখন ঘরে ফিরিয়া আস উভয় সময় তোমার অবস্থা এক রকম থাকে না। ঘর থেকে যাওয়ার সময় তোমার উপর অন্তরের নূরের প্রাধান্য থাকে। তোমার বক্ষ প্রশস্ত থাকে। অন্তরে ইবাদতের উদ্যম থাকে। দুনিয়ার প্রতি থাকে তোমার অনাসক্তি। কিন্তু ফিরিয়া আসার সময় তোমার মধ্যে এই শক্তি থাকে না। তোমার উন্নত আভ্যন্তরিন অবস্থাও থাকে না। আর এই উন্নত অবস্থা বিদ্যমান না থাকা এবং দূরীভূত হওয়ার কারণ শুধু সংশ্রবের পঙ্কিলতা এবং পার্থিবতার অন্ধকারে অন্তর নিমজ্জিত হওয়া। গোনাহ করার কারণ দূর হওয়া এবং যদি গোনাহ বন্ধ হওয়ার ফলে গোনাহের প্রভাবও উঠিয়া যাইত তাহা হইলে গোনাহের কারণ ও গোনাহ বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর আল্লাহর দিকে অন্তরের ভ্রমণ বাধাপ্রাপ্ত হইত না। বুঝা গেল গোনাহ বন্ধ হইয়া যাওয়ার পরও গোনাহের প্রভাব বিদ্যমান থাকে। ইহা অগ্নির সাথে তুলনা করা যায়। আগুনের দহন থামিয়া গেলেও দহনের প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। যেমন দাহিত বস্তু শেষ পর্যন্ত কাল রং বিশিষ্ট অঙ্গার হইয়া অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং উপায় (আসবাব) অবলম্বনকারী উপায় বর্জনকারীর ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্মল হইতে পারে না। এই অবস্থায় তাহার জন্য দুইটি জিনিস অত্যন্ত জরুরী। এক, ইলম। দুই, তাকওয়া। ইলমের দ্বারা সে হালাল হারাম জানিতে পারিবে। আর তাকওয়ার দ্বারা গোনাহে পতিত হওয়া থেকে বাঁচিবে। ইলমের প্রয়োজন এই জন্য যে বেচাকেনা, লেনদেন, চুক্তি, নগদ অর্থের লেনদেন প্রভৃতির সাথে যে সব আহকাম সম্পর্কিত তাহা জানা তাহার জন্য একান্ত জরুরী। সাথে সাথে ইহাদের মধ্যে কোনটি ওয়াজিব, কোনটি ফরয উহা জানাও একান্ত অপরিহার্য। যাহাতে কোন আহকাম তাহার থেকে ছুটিয়া না যায়।

সতর্কতা ঃ উপায় অবলম্বনকারীর জন্য কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী।

এক ঃ ঘর থেকে বাহির হওয়ার পূর্বে সে দৃঢ়ভাবে নিয়ত করিয়া লইবে যে, যদি কোন ব্যক্তি আমাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয় বা কোন দিক দিয়া আমাকে অস্থির করিয়াও তোলে তখন আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। কেননা বাজার এমন একটি স্থান যেখানে ঝগড়া-বিবাদ ও বাক-বিতণ্ডা হইয়াই থাকে। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন যে, তোমরা কি আবু যমযমের মত হইতে পার না? তাঁহার অভ্যাস ছিল যে সে ঘর হইতে বাহির হওয়ার সময় দোয়া করিত, হে আল্লাহ! আমি স্বীয় ইয্যত সম্মান মুসলমানদের জন্য সদকা করিয়াছি।

দুই ঃ ঘর হইতে বাহির হওয়ার পূর্বে ওজু করিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া আল্লাহ পাকের কাছে এই দোআ করিয়া লওয়া উচিত যে, এই ভ্রমনে আল্লাহ পাক যেন তাহাকে নিরাপদ রাখেন। কেননা সে তো জানে না যে, তাহার জন্য কি কি নির্ধারিত রহিয়াছে। কেননা যে বাজারে যায় সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে যুদ্ধে যায়। সুতরাং মুসলমানদের উচিত সে যেন আল্লাহর রজ্জুকে আকঁড়াইয়া ধরে এবং তাওয়াক্কুলের লৌহ বর্ম পরিধান করে যাহাতে শত্রুর অনিষ্ট হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অর্থাৎ বাজারে শয়তানের পুরা দখল থাকে। সুতরাং শয়তানের এবং তাহার জ্বীন ইনসান অনুচরদের ধোকা হইতে মুক্তি প্রার্থনা করা অত্যাবশ্যক। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আশ্রয়ে প্রবেশ করিয়াছে। সে সোজা রাস্তা পাইয়াছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি নির্ভর করিয়াছে আল্লাহই তাহার জন্য যথেষ্ট।

তিন ঃ যখন ঘর হইতে বাহির হও। তখন পরিবার-পরিজন, সন্তানাদি, ঘরবাড়ী এবং ঘরবাড়ীর আসবাবপত্র আল্লাহ পাকের কাছে সোপর্দ করিয়া যাওয়া উচিত। যাহাতে ইহাদের উপর আল্লাহ পাকের হেফাজত আরও অধিক হয় এবং নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিবে-

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ *

আল্লাহ পাক উত্তম হেফাজতকারী এবং সর্বাধিক মেহেরবানী করনেওয়ালা। হাদীছের মধ্যে অন্য একটি দোয়াও বর্ণিত হইয়াছে। তাহাও পাঠ করিবে-

اللهم انت الصاحب فى السفر و الخليفة فى الاهل و الولد و المال *

হে আল্লাহ! আপনি সফরের সাথী এবং পরিবার-পরিজন, সন্তানাদি এবং ধন-সম্পদের যিম্মাদার।

কেননা, আল্লাহর কাছে অর্পণ করা হইলে পুনরায় ইহাদিগকে ভাল অবস্থায় ফিরিয়া পাওয়ার আশা করা যায়। এই সম্পর্কে একটি ঘটনা রহিয়াছে। তাহা হইল এক ব্যক্তি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করিল। তাহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। যখন সফরে রওয়ানা করিল তখন আল্লাহ পাকের কাছে দোআ করিল, হে আল্লাহ! এই নারীর গর্ভে যাহা আছে তাহা আমি তোমার কাছে সোপর্দ করিলাম। ঘটনাচক্রে তাহার সফরকালীন সময়ে তাহার স্ত্রী ইন্তিকাল করিল। সফর থেকে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। লোকজন বলিল, সে তো গর্ভবতী অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করিয়াছে। রাত্রে দেখিতে পাইল যে, কবরস্থান হইতে একটি আলোক রশ্মি বাহির হইয়া আসিতেছে। সে আলোক রশ্মি অনুসরণ করিয়া কবরস্থানের দিকে চলিল। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইল যে, আলোক রশ্মিটি তাহারই স্ত্রীর কবর হইতে বাহির হইতেছে। একটি ছোট্ট শিশু তাহার মৃতা স্ত্রীর স্তন থেকে দুধ পান করিতেছে। তখন অদৃশ্য থেকে কে যেন আওয়াজ দিয়া বলিতেছে যে তুমি তো সফরে যাওয়ার সময় শিশুকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করিয়া গিয়াছিলে। তাই এখন তুমি তাহাকে পাইয়াছ। যদি তুমি উভয়কে সোপর্দ করিয়া যাইতে তাহা হইলে উভয়কে পাইতে।

চার ঃ যখন ঘর হইতে বাহির হইবে তখন নিম্নোক্ত দোআটি পাঠ করা তাহার জন্য মুস্তাহাব।

بسم الله توكلت على الله لا حول و لا قوة الا بالله *

আল্লাহর নামে চলিলাম। আল্লাহর প্রতি নির্ভর করিলাম। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও সাহায্যে গোনাহ থেকে বাঁচা যাইবে না এবং তাঁহার সাহায্য ব্যতীত ইবাদতেও শক্তি পাওয়া যাইবে না।

এই দোআ পাঠ করার ফলে শয়তান নিরাশ হইয়া যায়

পাঁচ ঃ মানুষকে সৎকার্যের আদেশ করিবে। আর অসৎকার্য থেকে বাধা দিবে। যেহেতু আল্লাহ পাক তাহাকে শক্তি ও তাকওয়া নামক দুইটি নিয়ামত দান করিয়াছেন। সে সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যের নিষেধ করাকে উল্লেখিত নিয়ামতদ্বয়ের শুকরিয়া বলিয়া মনে করিবে। অধিকন্তু সে যেন আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত ইরশাদ স্বরণ করে। আল্লাহ পাক বলেন-

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ *

এমন লোক যে যদি আমি তাহাদিগকে যমীনে শক্তি প্রদান করি; তাহা হইলে তাহারা নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, সৎকার্যের আদেশ করিবে এবং অসৎ কার্য হইতে বিরত রাখিবে এবং আল্লাহর জন্যই সমস্ত কাজের শেষফল।। সুতরাং যে ব্যক্তির জন্য সৎকার্যের আদেশ করা আর অসৎকার্যের নিষেধ করা সম্ভব এবং ইহা করিতে গিয়া তাহার জীবনের বা ইয্যত সম্মানের বা ধন সম্পদের উপর কোন বিপদ না আসে তাহা হইলে সে এই কার্যের জন্য সামর্থ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। আর এই কার্য সম্পাদন করা এমন ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হইয়া যায়। আর যদি সৎকার্যের আদেশ ও অসৎ কার্যের নিষেধ করিতে গিয়া কোন বিপদের আশংকা থাকে তখন তাহার উপর থেকে ওয়াজিব রহিত হইয়া যায়। তখন অসৎ কার্য থেকে নিষেধ না করিতে পারিলে

শুধু অন্তর দ্বারা খারাপ বুঝাই যথেষ্ঠ

ছয় ঃ চলার সময় নিরবতা ও গাম্ভীর্যতার সাথে চলিবে। আল্লাহ পাক বলিতেছেন-

عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا *

আল্লাহ পাকের খাছ বান্দারা এমন লোক যাহারা যমীনের উপর নরমভাবে চলে। আর যখন জাহেল লোকেরা তাহাদিগকে সম্বোধন করে তখন তাহারা বলে সালাম।

নিরবতা ও গাম্ভীর্যতা অবলম্বন করা শুধু চলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রতিটি কার্যে নিরবতা অবলম্বন করা এবং প্রতিটি বিষয়ে স্বাতন্ত্রতা অবলম্বন করা উচিত।

সাত ঃ বাজারে গিয়া আল্লাহ পাককে স্বরণ রাখিবে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, গাফেল লোকদের মধ্যে যিকর করণেওয়ালার মর্যাদা জিহাদের ময়দান হইতে পলায়নকারীদের তুলনায় জিহাদে রত মুজাহিদের মর্যাদার অনুরূপ। বাজারে আল্লাহর যিকরকরনেওয়ালার উদাহরণ মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তির উদাহরণ।

পূর্ববর্তী কোন কোন মানুষের অভ্যাস ছিল যে, তাহারা খচ্চরের উপর আরোহন করিয়া বাজারে যাইত আর আল্লাহ পাকের যিকর করিয়া ফেরত আসিত। তাহাদের বাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্য একমাত্র ইহাই ছিল।

আট ঃ বেচাকেনা এবং উপার্জনের সময় জামাতের সাথে নামাজ পড়ার ব্যাপারে গাফেল থাকিবে না। কেননা এই সব ব্যস্ততার কারণে যদি নামায দুর্বল হয় তাহা হইলে আল্লাহ পাক গোস্বা হইয়া যান এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে সে বরকত হারাইবার যোগ্য হইয়া পড়ে। বান্দার এই ব্যাপারে লজ্জিত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ পাক বান্দাকে দেখিতে থাকিবেন যে, বান্দা স্বীয় ফিকিরে পড়িয়া স্বীয় প্রভুর হক আদায়ে অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছে। সলফে সালেহীনদের মধ্যে কাহারও কাহারও এমন অভ্যাস ছিল যে, তাহারা হাতুড়ী হাতে নিজের কাজ করিতেছিলেন। কাজ করিবার জন্য হাতুড়ী উপরে উঠাইয়াছেন। আর এই দিকে মুয়ায্যিন আযান শুরু করিয়াছে। মুয়ায্যিনের আযানের শব্দ শুনিয়া হাতুড়ি পিছনের দিকেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। আর সামনে আনেন নাই। তাহারা এইরূপ করিয়াছেন যাহাতে আল্লাহ পাকের ইবাদতের দিকে আহবান শুনার পর তাহারা কোন কাজে লিপ্ত আছেন বলিয়া সাব্যস্ত না হয়।

যখন মুয়ায্যিনের আওয়াজ শুনে তখন সে যেন আল্লাহ পাকের ইরশাদ স্বরণ করে- يا قومنا اجيبوا داعى الله হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা আল্লাহর প্রতি আহবানকারীর কথা মান্য কর। আল্লাহ পাক আরও বলেন-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ *

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের কথা মান্য কর যখন তোমাদিগকে এমন জিনিসের দিকে আহবান করা হয় যাহা তোমাদের হায়াতের কারন হয়।

আল্লাহ পাক আরও বলেন- استجيبوا لربكم স্বীয় প্রভুর কথা মান্য কর। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে থাকা অবস্থায় স্বীয় জুতা মোবারক ঠিক করিতেন এবং খাদেমের কাজে সহায়তা করিতেন। কিন্তু যখন আযানের আওয়াজ হইত তখন ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেন। তখন তাহার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইত যে, তিনি যেন আমাদিগকে চিনেনই না।

নয় ঃ শপথ করিবে না। নিজের জিনিসপত্রের সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করিবে না। এই সম্পর্কে খুব শক্ত ধমকি আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ব্যবসায়ীরা দুশ্চরিত্র গোনাহগার হয় তবে যে নেক কাজ করে এবং সত্য কথা বলে সে এইরূপ নয়।

দশ ঃ গীবত এবং চোগলখুরী (পরনিন্দা) করিবে না। আল্লাহ পাকের হুশিয়ারী বানী স্বরণ রাখিবে- و لا يغتب بعضكم بعضا তোমাদের মধ্যে একে অপরের গীবত করিবে না। তবে কি তোমরা ইহা পছন্দ কর যে, স্বীয় মৃত ভ্রাতার গোশত খাইবে?

নিঃসন্দেহে ইহা তোমাদের পছন্দ হইবে। তবে এ কথাটিও স্বরণ রাখিবে যে, গীবত শ্রবণকারী গীবতকারীর সমতুল্য। সুতরাং যদি তাহার সামনে কেহ কাহারও গীবত করে তাহা হইলে তাহার উচিত গীবতকারীকে গীবত বলা থেকে বাধা প্রদান করা। যদি গীবতকারী তাহার বাধা না শুনে তাহা হইলে সে যেন ঐ মজলিশ থেকে উঠিয়া অনত্র চলিয়া যায়। মাখলুকের কাছে লজ্জিত হওয়ার ভয় যেন তাহাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মজলিশ ত্যাগে বিরত না রাখে। কেননা আল্লাহ সম্বন্ধে লজ্জা করা উচিত। মানুষের সন্তুষ্টি তলব করা অপেক্ষা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের সন্তুষ্টি তলব করা অধিক উপযোগী। আল্লাহ পাক নিজেই বলেন, و الله و رسوله احق ان يرضوه আল্লাহ ও তদীয় রাসূল

অধিক হকদার যে, মানুষ তাহাদেরকে রাজী করে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, গীবত করা ইসলাম ধর্মে থাকা অবস্থায় ছত্রিশবার যিনা করা অপেক্ষাও মারাত্মক।

শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, উপায় অবলম্বনকারী দরিদ্র ব্যক্তির চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। যদি কোন দরিদ্রের মধ্যে এই সব বৈশিষ্ট্য না থাকে তাহা হইলে সে যদি সমস্ত দুনিয়ার মধ্যে বড় জ্ঞানীও হয় তবুও তাহাকে সম্মান ও ইয্যত কর না। এক, জালেমদের থেকে দূরে থাকা। দুই, আখেরাতওয়ালাদের প্রাধান্য দেওয়া। তিন, অভাবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা। চার, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা।

বাস্তাবিকই হযরত শায়খ খুব সত্য বলিয়াছেন। কেননা জালেমদের থেকে দূরে থাকিলে দ্বীন নিরাপদ থাকে। কারণ জালিমদের সংশ্রব ঈমানী নূরকে অন্ধকারে পরিণত করিয়া ফেলে। তাহাদের থেকে দূরে থাকা আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রেহাই পাওয়া। আল্লাহ্ পাক বলেন-

فَلَا تَرْكَنُوا اِلَي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ *

জালেমদের প্রতি ঝুঁকিও না। তাহা হইলে তোমাদিগকে জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করিবে।

হযরত শায়খ বলিয়াছেন, আখেরাতওয়ালাদের প্রাধান্য দেওয়ার কথা। ইহার অর্থঃ ওলী বুযুর্গদের কাছে বেশী বেশী আসা যাওয়া করিবে। তাহাদের থেকে বরকত ও ফয়েজ হাসিল করিবে। যাহাতে তাহার অবলম্বিত উপায় অনিষ্টকারী বিষয়সমূহ হইতে মুক্ত হইয়া পড়ে আর এই সকল মহামনিষীদের বরকত ও প্রভাব তাহাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়। অনেক সময় তাহাদের দ্বারা তাহার অবলম্বিত উপায়েও সাহায্য সহযোগীতা পৌঁছে। তাহাদের প্রতি আস্থা ও ভালবাসা তাহাকে গোনাহ হইতে দূরে রাখে।

হযরত শায়খ অভাবী ও ক্ষুধার্তদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের কথা বলিয়াছেন। কারণ, বান্দার কাছে আল্লাহ পাকের যে নিয়ামত রহিয়াছে উহার শুকরিয়া আদায় করা বান্দার জন্য ওয়াজিব। সুতরাং আল্লাহ পাক যখন তোমার প্রতি উপায় অবলম্বনের দ্বার প্রশস্ত করিয়াছেন তখন তুমি তাহাদের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখ যাহাদের জন্য এই দ্বার বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

আল্লাহ পাক অভাবীদের দ্বারা বিত্তশালীদের আর বিত্তশালীদের দ্বারা অভাবীদের পরীক্ষা করেন। যেমন আল্লাহ পাক নিজেই বলেন-

وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُوْنَ وَ كَانَ رَبكَ بَصِيْرًا *

আমি তোমাদের কতককে অপর কতকের জন্য পরীক্ষা বানাইয়াছি। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করিবে? এবং আপনার প্রতিপালক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

অভাবী ও দরিদ্রের অস্তিত্ব আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে বিত্তশালীদের জন্য বড় নিয়ামত। কেননা, বিত্তশালীদের জন্য অভাবী ও দরিদ্ররা এমন কতক লোক যাহারা বিত্তশালীদের বোঝা বহন করিয়া আখেরাত পর্যন্ত লইয়া যায়। অর্থাৎ বিত্তশালীরা যদি নিজেদের মাল আসবাব পরকালে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাদের এই ইচ্ছা অভাবী ও দরিদ্রদের দ্বারাই পূর্ণ হইতে পারে।

আল্লাহ পাক যদি গরীব লোক সৃষ্টি না করিতেন তাহা হইলে বিত্তশালীদের দান সদকা কিভাবে কবুল হইত? আর তাহাদের দান গ্রহণকারী লোক কোথায় পাইত? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হালাল সম্পদ হইতে দান করে। আর আল্লাহ পাক হালাল সম্পদই কবুল করেন। যেন সে তাহার দানকৃত সম্পদ আল্লাহ পাকের হাতে রাখিয়াছে। আর আল্লাহ পাক তাহা পালন করিতে থাকেন যেমন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বাছুর বা উট শাবক পালন করিয়া থাকে। এমনকি ইহার এক এক লোকমা ওহুদ পাহাড়ের সমান হইয়া যায়। * অর্থাৎ ইহার সওয়াব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইজন্যই দাতার দান গ্রহণকারী কোন লোক না পাওয়া কেয়ামতের একটি অন্যতম নিদর্শন।

হযরত শায়খ (রহঃ) তাহাদিগকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করিবার জন্য বলিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, উপায় অবলম্বনকারী দরিদ্র যখন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদতে লাগিয়া থাকার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই। তখন তাহার জন্য কমপক্ষে এতটুকু তো অপরিহার্য যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করার ক্ষেত্রে যেন কোনরূপ অলসতা তাহার থেকে প্রকাশ না পায়। কেননা, তাহার এই বাধ্যবাধকতা তাহার জন্য নতুন নূর এবং অন্তর্দৃষ্টির কারণ হইবে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, একাকী নামায পড়া অপেক্ষা জামাতের সাথে নামায পড়া পঁচিশ গুণ অধিক সওয়াব রাখে। অন্য এক হাদীছে সাতাশ গুণ অধিক সওয়াবের কথা আসিয়াছে। যদি

---

* من تضدق بصدقة من كسب طيب و لا يقبل الله تعالى الا طيبا كان كانما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربى احدكم فلوة او فيلة حتى ان اللقمة لتعود مثل جبل احد

দোকান বা ঘরে নামায পড়ার অনুমতি প্রদান করা হইত তাহা হইলে সমস্ত মসজিদ খালি পড়িয়া থাকিত। এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন-

فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهٗ * يُسَبِّحُ لَهٗ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ

* رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله

"আল্লাহর নূর এই সকল ঘরের মধ্যে আছে আল্লাহ পাক যেগুলিকে উচ্চ করার হুকুম দিয়াছেন। এইসব ঘরে তাঁহার নামের যিকির করা হয় এবং সকাল সন্ধ্যা এমন সবলোক এই সব ঘরে তাঁহার তাসবীহ পাঠ করে যাহাদিগকে কোন ব্যবসা বানিজ্য এবং কোন বেচাকেনা আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল করিতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, জামাতের সাথে নামায পড়ার ফলে নামাযীর অন্তরে একতা সৃষ্টি হয়। একে অপরকে সাহায্য সহযোগীতা করার সুযোগ হয়। তাহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদিগকে একস্থানে সমবেত দেখা সম্ভব নয়।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জামাতের উপর আল্লাহর হাত। এই ক্ষেত্রে মূলকথা এই যে, যখন লোকজন সমবেত হয় তখন তাহাদের অন্তরের বরকত উপস্থিত লোকদের সামনে প্রকাশিত হয়। তাহাদের নূর আশে পাশের লোকের কাছে প্রসারিত হয়। লোকজন জামাতভুক্ত হইয়া একত্রিত হওয়ার উদাহরণ সৈন্যদলের ন্যায়। সেনাদলের একত্রিত ও সমবেত হওয়া তাহাদের জয়ী হওয়ার কারণ হয়। নিম্নোক্ত আয়াতও এই অর্থই বহন করে-

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ *

"আল্লাহ পাক এমন সব লোকদিগকে ভালবাসেন যাহারা আল্লাহর রাস্তায় সারিবদ্ধ হইয়া জিহাদ করে যেন তাহারা একটি সুদৃঢ় অট্টালিকা।"

সংযোজন ঃ হে ঈমানদার! তুমি কোন কাজে ঘর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় ঘরে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত অবৈধ জিনিসমূহের প্রতি দৃষ্টি ফেলিও না বরং সর্বদা দৃষ্টি নীচু করিয়া রাখিও। ইহা তোমার অপরিহার্য কর্তব্য। আর আল্লাহ পাকের ইরশাদ স্মরণ রাখিও-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ * ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ *

"হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তাহারা যেন নিজেদের দৃষ্টি নীচু করিয়া চলে, এবং নিজেদের লজ্জাস্থান

হেফাজত করে; ইহা তাহাদের জন্য বড় পবিত্র কথা।"

দৃষ্টি আল্লাহ পাকের বড় নিয়ামত। আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নিয়ামতের না শুকরিয়া করা উচিত নয়। অধিকন্তু ইহা একটি আমানতও বটে। সুতরাং ইহার খেয়ানত করা উচিত নয়। আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত ইরশাদ স্মরণ রাখা উচিত।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ *

"আল্লাহ পাক চোখের খেয়ানতের কথা জানেন এবং বক্ষদেশে যাহা গোপনীয় রহিয়াছে তাহাও জানেন।"

আল্লাহ পাক আরও বলিয়াছেন-

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى *

"তবে কি তাহার খবর নাই যে, আল্লাহ পাক দেখেন?"

যখন কোন অবৈধ জিনিসের দিকে দেখার ইচ্ছা কর তখন অন্তরে এই কথা জাগ্রত কর যে, আল্লাহ পাক তোমাকে দেখিতেছেন। যখন কাহারও দৃষ্টি কোন অবৈধ জিনিসের প্রতি পড়ে আর যদি সে স্বীয় দৃষ্টি নীচু করিয়া ফেলে তখন আল্লাহ পাক তাহার অর্ন্তদৃষ্টি প্রশস্ত করিয়া দেন। ইহা তাহার এই আমলের একটি বড় বিনিময়। সুতরাং যে ব্যক্তি দৃশ্য জগতে তাহার দৃষ্টি সংকীর্ণ করিবে আল্লাহ পাক অদৃশ্য জগতে তাহার দৃষ্টি প্রশস্ত করিয়া দেন। কোন এক মনীষীর বাণী, কোন ব্যক্তি যখন কোন হারাম জিনিস দেখিয়া দৃষ্টি নীচু করিয়া ফেলে আল্লাহ পাক তাহার অন্তরে এক নূর সৃষ্টি করেন। এই ব্যক্তি এই নূরের স্বাদ পাইতে থাকে।

মূল উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন

অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের অভিমত এই যে, যেহেতু আল্লাহ পাকের ব্যবস্থাপনা রহিয়াছে সুতরাং বান্দার নিজের জন্য নিজের পক্ষ হইতে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা আল্লাহ পাকের প্রতিপালনের গুণের সাথে দ্বন্দ্ব করার নামান্তর। তাহাদের এই অভিমতের বিশ্লেষণ এইভাবে হইতে পারে যে, যদি কোন প্রকার বিপদাপদ তোমার প্রতি আপতিত হয় আর তুমি তাহা অপসারিত করার চেষ্টা কর অথবা তোমার থেকে রিযক অপসারিত করিয়া লওয়া হয় আর তুমি তাহা পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে ইচ্ছা কর অথবা যদি তুমি কোন বিষয় সম্পর্কে জান যে, আল্লাহ পাক ইহার যিম্মাদার, তোমার জন্য ইহার ব্যবস্থাপক তিনিই: এমতাবস্থায়ও তুমি ইহা সম্পর্কে চিন্তা ফিকির করিতে থাক তাহা

হইলে তোমার এই ধরণের কার্য আল্লাহ পাকের প্রতিপালন গুণের সাথে দ্বন্দ্ব করা হইতেছে বলিয়া বুঝা যাইবে এবং তোমার এই পদক্ষেপ সত্যিকারের বান্দা হওয়ার পরিধি বহির্ভূত কাজ বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।

এমতাবস্থায় আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত বাণী স্মরণ কর। আল্লাহ পাক বলেন-

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ *

"তবে কি মানুষ ইহা দেখে নাই যে, আমি এক ফোটা বীর্য হইতে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি? অতঃপর এখন সে অকস্মাৎ প্রকাশ্য ঝগড়াকারী হইয়া পড়িয়াছে।"

অত্র আয়াতে মানুষকে ভৎর্সনা করা হইয়াছে। কেননা সে স্বীয় সৃষ্টি মূল সম্পর্কে অসতর্ক হইয়াছে। সৃষ্টিকর্তার সাথে ঝগড়া বাধাইয়া দিয়াছে। স্বীয় সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ হইয়া সৃষ্টিকর্তার সাথে দ্বন্দ্ব ও মোকাবিলা শুরু করিয়াছে। যে এক ফোটা বীর্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে তাহার সৃষ্টিকর্তার সাথে দ্বন্দ্ব করা, তাঁহার ভাঙ্গাগড়ার বিরোধিতা করা কিভাবে উচিত হইতে পারে? সুতরাং আল্লাহ পাক তোমার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট থাক। নিজের জন্য নিজের ব্যবস্থা অবলম্বন হইতে বিরত থাক। আল্লাহ তোমার প্রতি মেহেরবান হউক। অদৃশ্য জগত অবলোকন করার ক্ষেত্রে অন্তরের সামনে বড় পর্দা হইল নিজের জন্য নিজের ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করার পিছনে যে কারণ রহিয়াছে তাহা হইল নিজের প্রতি ভালবাসা অর্থাৎ স্বপ্রিয়তা। যদি তুমি নিজের সম্পর্কে ফানা হইয়া (অর্থাৎ স্বীয় অস্তিত্ব মিটাইয়া দিয়া) বাকা বিল্লাহের (অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব দেখার) পর্যায় অর্জন কর তাহা হইলে তো তোমার কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনই পড়িবে না। এমন বান্দা কত নিকৃষ্ট যে আল্লাহর কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ আর আল্লাহর সাহায্য অর্জন সম্পর্কে অসতর্ক। তবে কি তুমি আল্লাহ পাকের এই বাণী শ্রবণ কর নাই যে আল্লাহ পাক বলেন, قل كفى بالله হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি বলুন, আল্লাহই যথেষ্ট। সুতরাং আল্লাহর ব্যবস্থাপনা বিরাজমান থাকার পরও যে নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে কিভাবে আল্লাহকে যথেষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিল? যদি সে আল্লাহকে নিজের জন্য যথেষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিত তাহা হইলে তাহার এই বিশ্বাস তাহাকে নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতে বিরত রাখিত।

সতর্কতা ও ঘোষণা

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহর মারেফাত তলবকারীরাই ব্যবস্থা অবলম্বনের ফাঁদে পতিত হয়। আর এই রাস্তায় তাহাদের একীন সুদৃঢ় ও বদ্ধমূল হওয়ার পূর্বে তাহারা ইহার শিকার হইয়া থাকে। কেননা অসতর্ক এবং বদ চরিত্র লোকেরা তো কবীরা গুনাহ, শরীয়ত পরিপন্থী কার্যে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণের ক্ষেত্রে শয়তানের পরামর্শ মানিয়াই থাকে। সুতরাং তাহাদিগকে ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজনটাই কি? তাহাদিগকে এই ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার সাথে সাথে তাহারা ইহা গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের জন্য ইহা খুব বড় একটা ফাঁদ হয় নাই। বরং আল্লাহর মারেফাত তলবকারীদের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফাঁদ বিছাইয়া দেওয়া হয়। কেননা শয়তান ইহা ব্যতীত অন্য কোন রাস্তায় তাহাদের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা এবং স্বীয় সমস্যা সমাধানের প্রতি মনোনিবেশ করা ধারাবাহিক ও নিয়মিত ইবাদতকারীকে তাহার নিয়ম মাফিক ইবাদত ও আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে দূরে সরাইয়া দেয়। শয়তান কোন কোন সময় নিয়মিত ইবাদতকারীকে দুর্বল পাইয়া তাহার অন্তরে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ ঢালিয়া দেয় আর এই পরামর্শে পথভ্রষ্টতার বীজ লুকায়িত থাকে যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। শয়তানের এই সর্ব ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ দানের পিছনে উদ্দেশ্য হইল ইবাদতকারীর ইবাদতের নির্ভেজাল ও স্বচ্ছ সময়ে তাহাকে ইবাদত করিতে না দেওয়া। কেননা শয়তান বড় হিংসুক। হিংসুক চরমপর্যায়ের হিংসা শুরু করে যখন ইবাদতকারীর ইবাদতের সময় নির্ভেজাল থাকে। তাহার আভ্যন্তরিন অবস্থা ভাল থাকে। অর্থাৎ জাগতিক চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত থাকে। আর শয়তান এমতাবস্থায় ব্যবস্থা অবলম্বনের বিভিন্ন পরামর্শের মাধ্যমে তাহার অন্তর ভেজালযুক্ত করিয়া দেয়। তাহার ইবাদতের সময়ের স্বচ্ছতা নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং সে ইবাদতে একাগ্রচিত্ততা হারাইয়া ফেলে। অধিকন্তু ব্যবস্থা অবলম্বনের ধোকা খুব সূক্ষ্ম হয়। ব্যবস্থা অবলম্বনের কুমন্ত্রনা প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে তাহার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া আসে। ইহার কুমন্ত্রনা অনুধাবন করা মুশকিল। সুতরাং কোন ব্যক্তির যদি পরিবেশ এমন হইয়া পড়ে যে, তাহাকে আরজ বা আগামীকল্যের উপজীবিকার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হয়। আর সে ব্যবস্থা অবলম্বনের হাত থেকে মুক্তি পাইতে চায় তাহা হইলে এই অবস্থায় তাহার উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। উপায়টি এই যে সে তখন বদ্ধমূল একীন করিবে যে, আল্লাহ

পাক তাহার রিযিকের যিম্মাদার। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- و ما من دابة فى الارض الا على الله رزقها "যমীনের উপর চলে এমন কোন জন্তু নাই আল্লাহ পাক যাহার রিযকের যিম্মাদার নহেন।" রিযিক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে পৃথকভাবে রিযিকের অধ্যায়ে করা হইবে। ইনশাআল্লাহ।

যদি কাহারও এমন কোন শত্রু থাকে যাহার মোকাবিলা করার শক্তি তাহার নাই। আর এই শত্রুর জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। এমতাবস্থায় ব্যবস্থা অবলম্বনের হাত থেকে বাঁচিয়া থাকার উপায় সে বদ্ধমূল একীন করিবে যে, সে যাহাকে ভয় করিতেছে তাহার সমস্ত অবস্থা আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রনে রহিয়াছে। তাহার কোন কিছু করার ক্ষমতা নাই। আল্লাহ পাক তাহাকে যাহা করার সুযোগ প্রদান করেন সে তাহাই করিতে পারিবে। ইহার অতিরিক্ত কিছুই করিতে পারিবে না। আর সাথে সাথে আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত বাণীর প্রতি লক্ষ্য করা চাই। আল্লাহ পাক বলেন-

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ *

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তাহার জন্য যথেষ্ট।"

অন্য এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন-

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ * وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ *

"তবে কি আল্লাহ বান্দার জন্য যথেষ্ট নহে? তাহারা আপনাকে খোদা ব্যতীত অন্যদের ভয় প্রদর্শন করিতেছে।"

আল্লাহ পাক আরও বলিয়াছেন-

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا * وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ *

"ঈমানদারেরা এমন যে যখন তাহাদিগকে অন্যান্য লোকেরা বলিল যে, মক্কাবাসীরা তোমাদের সাথে লড়িবার জন্য প্রচুর সৈন্য ও হাতিয়ার সংগহ করিয়াছেন। তাহাদিগকে ভয় কর। তখন তাহাদের ঈমান আরও বাড়িয়া গেল এবং তাহারা জবাব দিল যে, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ঠ। তিনি আমাদের উত্তম অভিভাবক। অতঃপর তাহারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ঘরে ফিরিয়া আসিল। অথচ তাহাদিগকে কোন অনিষ্টতা স্পর্শও করে নাই। তাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করিয়াছিল। আল্লাহ পাক মহাঅনুগ্রহকারী।"

অনুরূপভাবে সে যেন স্বীয় অন্তর ও কর্ণ উভয় আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত ইরশাদের দিকে ঝুঁকাইয়া রাখে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ *

"হযরত মুসা (আঃ)-এর মাতার প্রতি নির্দেশ করা হইল যে, যখন তুমি মুসা সম্পর্কে ভীত হইয়াছ; তখন তুমি তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর; তাহার সম্পর্কে ভয় করিবে না আবার ব্যতিব্যস্তও হইবে না।" অতএব আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করাই অধিক উপযুক্ত। আর তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি আশ্রয় দিয়া থাকেন। আল্লাহ পাক বলেন-

و هو يجير و لا يجار عليه *

"আল্লাহ পাক আশ্রয় প্রদান করেন। তাঁহার কাছে অপরাধীকে অন্য কেহই আশ্রয় প্রদান করে না।"

আল্লাহ পাকের কাছেই হেফাজত প্রার্থনা করা উচিত। তাঁহার কাছে হেফাজত প্রার্থনা করিলে তিনি হেফাজত করেন। তিনি নিজেই বলেন-

وَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ *

"আল্লাহ পাক উত্তম হেফাজতকারী। তিনি সর্বাধিক অনুগ্রহকারী।"

আর যদি তোমার নিম্নোক্ত কারণে ব্যবস্থা অবলম্বনের চিন্তাভাবনা করিতে হয় যে, তুমি কাহারও কাছে ঋণী। ঋণ আদায় করিবার জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে যে সময় নির্ধারিত হইয়াছিল তাহা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তোমার ঋণ আদায় করার মত কোন পয়সা নাই। মহাজনও ধৈর্যধারণ করিতেছে না। এমতাবস্থায় তুমি বদ্ধমূল বিশ্বাস করিবে যে, আল্লাহ পাক তো স্বীয় অনুগ্রহে তোমার প্রয়োজনের সময় তোমাকে করজ দিতে পারে এমন ব্যক্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তো এখনও মওজুদ আছেন। সুতরাং তিনি স্বীয় মেহেরবাণীতে এখন তোমার করজ পরিশোধের ব্যবস্থাও করিয়া দিতে পারেন। কুরআনে করীমে রহিয়াছে-

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ *

"সৎকর্মের বিনিময় সৎকর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়"

এই আয়াতের সারকথা হইল, আল্লাহ পাক তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, সুতরাং তুমি তাঁহার প্রতি সুধারনা পোষন কর। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বীয় হস্তগত জিনিসের ব্যাপারে স্থিরচিত্ত থাকে আর আল্লাহ পাকের হস্তগত

জিনিসের ব্যাপারে স্বস্থিরতা বোধ করে না তাহার জন্য বড়ই পরিতাপ।

আর যদি তোমার এই কারণে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় যে, তুমি স্বীয় সন্তানাদি ঘরে রাখিয়া আসিয়াছ। কিন্তু তাহাদের ভরন-পোষন চলিতে পারে এই পরিমাণ সম্পদ তোমার হাতে নাই। এই সময় তুমি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ কর যে, তোমার মৃত্যুর পরও আল্লাহ পাক তাহাদের ভরনপোষনের ব্যবস্থা করিবেন। সুতরাং তিনি তোমার জীবদ্দশায় এবং তোমার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি উভয় অবস্থায় তাহাদের ভরন-পোষনের ব্যবস্থা করিবেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-

اللهم انت الصاحب فى السفر و الخليفة فى الاهل *

"হে আল্লাহ! আপনি সফরে আমাদের সাথী এবং আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের পরিবার পরিজনের যিম্মাদার।" সুতরাং তোমার উপস্থিতিতে তুমি যে খোদার প্রতি ভরসা রাখিতেছ তোমার অনুপস্থিতেও তাঁহার প্রতি ভরসা রাখ। এক বুযুর্গের কথা শুন। তিনি বলেন, আমি যে খোদার মুখাপেক্ষী যাহার কাছে আমি ধরনা দেই। তাহাকেই আমার পরিবার পরিজনের হেফাজতকারী রাখিয়া আসিয়াছি। তিনি তাহাদের সর্বাবস্থার খবর রাখেন। তাহাদের অবস্থা এক পলকের জন্যও তাহার কাছে গোপনীয় নয়। তাঁহার অনুগ্রহ আমার অনুগ্রহ অপেক্ষা প্রশস্ত। হে শ্রোতা! আল্লাহ পাক তোমার অপেক্ষা অনেক বেশী অনুগ্রহশীল। যাহারা অন্যের (আল্লাহর) দায়িত্বে রহিয়াছে তুমি তাহাদের সম্পর্কে চিন্তা করিও না।

যদি তুমি অসুস্থ হও। আর অসুস্থতা সম্পর্কে তোমার ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অধিকন্তু তুমি ধারণা করিতেছ যে, এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তোমার এই অসুস্থতা বিদ্যমান থাকিবে। তাই এই সম্পর্কে তোমার ভয় হইতেছে। এমতাবস্থায় তুমি বিশ্বাস কর যে, প্রত্যেক বিপদের স্থায়ীত্বকাল নির্ধারিত। যেমন কোন প্রাণীর হায়াতও নির্ধারিত। নির্ধারিত সময়ের পর ইহা মরিয়া যায়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক বিপদ নির্ধারিত সময়ের পর কাটিয়া যায়।

যতক্ষণ পর্যন্ত ইহার নির্ধারিত সময় পুরা না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা শেষ হইবে না। আল্লাহ পাক বলেন-

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ *

"যখন তাহাদের হায়াত পুরা হইয়া যায় তখন তাহারা এক নিমিষের জন্য পিছনে যায় না আবার সামনেও বাড়ে না।"

এই সম্পর্কে একটি ঘটনা

এক শায়খের একটি পুত্র সন্তান ছিল। পিতা মৃত্যুবরণ করিল। পুত্র জীবিত। পিতা জীবিত থাকিতে ঘরে অর্থ কড়ির কোন অভাব ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর ভাটা পড়িল। পিতার অনেক বন্ধু বান্ধব অর্থাৎ মুরীদ ছিল। তাহারা ছিল ইরাকের অধিবাসী। পুত্র ভাবিল যে, এই অবস্থায় তাহার পিতার বন্ধুবান্ধবদের সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। তবে কাহার কাছে যাইবে? অবশেষে একজনের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করিল। সকলের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বাধিক প্রতাপশালী। অতঃপর সে ঐ ব্যক্তির কাছে গমন করিল। এই ব্যক্তি স্বীয় পীরের পুত্রকে দেখিয়া খুব সম্মান প্রদর্শন করিল। অতঃপর বলিল, হে আমার সম্মানিত! আমার সম্মানিতের পুত্র! কিজন্য আপনার আগমন? পীরের পুত্র বলিল, আমি পার্থিব সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া চলি। এখন আপনার কাছে আসিয়াছি এই জন্য যে, আপনি দেশের বাদশাহের কাছে আমার জন্য সুপারিশ করিবেন। যাহাতে তিনি আমার একটি ব্যবস্থা করেন। আর ইহার দ্বারা আমার রোজগারের ব্যবস্থা হইয়া যায়। পীরের পুত্রের আবেদন শুনিয়া সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত শির নত করিয়া বসিয়া রহিল। অতঃপর শিরোত্তলন করিয়া বলিল আমার জন্য ইহা সম্ভব নয়। আমি সন্ধ্যাকে সকাল করিতে পারিব না। আমি কোথায়। আর আপনি কোথায়? আপনি তো ইরাকের বিচারকের পদ লাভ করিবেন। এই বুযুর্গ মোরাকাবা করিয়া দেখিয়াছে যে কিছুকাল পর এই বালক ইরাকের বিচারকের পদ লাভ করিবে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাহাকে বিচারক নিয়োগ করিবার যে সময় নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা এখনও আসে নাই। এই জন্য সে বলিয়াছে যে, সে সন্ধ্যাকে সকালে পরিণত করিতে পারিবে না। অর্থাৎ যে জিনিসটি তাহার হস্তগত হওয়ার জন্য যে সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে উক্ত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তাহা তাহার হাতে তুলিয়া দেওয়া কিভাবে সম্ভব হইতে পারে?

তাহার কথা শুনিয়া পীর পুত্র অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেল। সে এই বুযুর্গের কথা বুঝিল না। ঘটনাচক্রে ইরাকের বাদশাহের পুত্রকে পড়া-লেখা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একজন শিক্ষকের প্রয়োজন দেখা দিল। বাদশাহ একজন উপযুক্ত শিক্ষক খোঁজ করিতে ছিলেন। এমতাবস্থায় কোন এক ব্যক্তি শায়খের পুত্রের সন্ধান বলিয়া দিল। বাদশাহ তাহাকে স্বীয় পুত্রের শিক্ষক নিয়োগ করিলেন। কিছুদিন পর সে বাদশাহের অনুচর নিয়োজিত হইল। এইভাবে তাহার পদোন্নতি হইতেছে। চল্লিশ বৎসর পর বাদশাহ ইন্তিকাল করিলেন। বাদশাহের পুত্র বাদশাহ হইল। সে স্বীয় ওস্তাদকে বিচারক নিয়োগ করিল।

হে শ্রোতা! তোমার এক স্ত্রী ছিল বা এক বাঁদী ছিল। সে সর্বদিক দিয়া তোমার স্বভাব চরিত্রের মোয়াফেক ছিল। তোমার সমস্ত প্রয়োজন পুরা করিত। তোমার ঘরের কাজ কারবার সম্পাদন করিত। কিন্তু এখন সে মরিয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে তোমার চিন্তা-ভাবনা করিতে হইতেছে। এই সম্পর্কে তোমার ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সুতরাং এই অবস্থায় তোমার বদ্ধমূল একীন করা একান্ত প্রয়োজন যে আল্লাহ পাক তোমাকে ইহা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহ ও দয়া এখনও শেষ হয় নাই। বা ইহাতে কোনরূপ ঘাটতিও পড়ে নাই। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে ইহা অপেক্ষাও অধিক সুন্দরী ও জ্ঞানবতী অন্য একটি স্ত্রী বা বাঁদীর ব্যবস্থা করার সম্পূর্ণ শক্তি রাখেন। সুতরাং জাহেল হইও না।

যে সব কারণে ব্যবস্থা অবলম্বনের ফিকিরে পড়িতে হয় তাহা অগনিত। ইহাদের সবগুলির বিবরণ প্রদান করা মুশকিল। এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক তোমাকে জ্ঞান দান করিলে তুমি নিজে নিজেই বুঝিতে পারিবে যে, কোন বিষয়ের সমাধান কিভাবে করিতে হয়।

সতর্কতা ঃ বান্দার ব্যবস্থা অবলম্বনের ফিকির নফসের মধ্যে পয়দা হয়। কলব যদি নফসের সংশ্রব ও আশংকা হইতে নিরাপদ থাকে তাহা হইলে ইহাতে ব্যবস্থা অবলম্বনের ফিকিরও আসিতে পারে না।

আমি শায়খ আবুল আব্বাস মুরসীর (রহঃ) কাছে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিতেন, আল্লাহ পাক ভূমণ্ডলকে পানির উপর সৃষ্টি করিয়াছেন। তখন ভূমণ্ডল পানির উপর এইদিক ওইদিক হেলিতেছিল। আল্লাহ পাক অতঃপর ভূমির উপর পাহাড় সৃষ্টি করিলেন। আর পাহাড়ের মাধ্যমে ভূমণ্ডলের অটল ও অনড় করিলেন। আল্লাহ পাক স্বীয় কালামে পাকে নিজেই ইরশাদ করেন-

و الجبال ارساها *

"এবং পর্বতমালাকে সংস্থাপন করিয়াছেন।"

অনুরূপভাবে আল্লাহ পাক নফস (প্রাণ) সৃষ্টি করার পর ইহা নড়াচড়া করিতেছিল। তখন তিনি বিবেকের (আকলের) মাধ্যমে ইহাকে অনড় ও স্থির করিলেন। এই পর্যন্ত হযরত শায়খ আবুল আব্বাসের (রাঃ)-এর বক্তব্য। সুতরাং যে ব্যক্তির মধ্যে পরিপূর্ণ বিবেক ও প্রশস্ত নূর রহিয়াছে। তাহার প্রতি পরোয়ারদিগারের পক্ষ হইতে শান্তি অবতীর্ণ হয়। আর তাহার নফসের অস্থিরতা দূরীভূত হইয়া যায়। আসবাব প্রদানকারী মহান আল্লাহ পাকের প্রতি নির্ভরতা পয়দা হয়। তাহার নফস স্থির হইয়া যায় অর্থাৎ আল্লাহর আহকামের সামনে সে নতশির হইয়া যায়। তিনি তাহার জন্য যে ফয়সালা করেন তাহা নির্দ্বিধায়

মানিয়া লয়। আল্লাহর সাহায্য ও অদৃশ্যের নূর হইতে তাহার সহায়তা হইতে থাকে। সে তাকদীরের মোকাবিলা করা হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। স্বীয় প্রভুর হুকুম মান্য করে। সে একীন করে যে আল্লাহ পাক সবকিছু প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তবে কি তোমার প্রভু তোমার জন্য যথেষ্ট নহেন? সে ইহার বিশ্বাসী হইয়া পড়ে। এইভাবে সে নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লিখিত সম্বোধিত ব্যক্তির যোগ্য হইয়া পড়ে।

يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ وَ ادْخُلِىْ جَنَّتِىْ *

"হে তুষ্ট নফস! স্বীয় প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন কর; তুমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট আর তিনিও তোমার দিকে সন্তুষ্ট। সুতরাং আমার বান্দাদের অন্তর্গত হইয়া যাও এবং আমার বেহেশতে প্রবেশ কর।"

এই আয়াতে নফসের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও গুণের কথা উল্লেখ রহিয়াছে।

প্রথম গুণ ঃ নফস তিন প্রকার। এক- আম্মারা, দুই- লাওওয়ামা, তিন- মুতমাইন্না। আল্লাহ পাক স্বীয় গ্রন্থে একমাত্র নফসে মুতমাইন্না ব্যতীত অন্য কোন নফসকে সম্বোধন করেন নাই। নফসে আম্মারা সম্পর্কে বলিয়াছেন-

اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْٓءِ *

"নফস খারাপ কার্যের বেশী বেশী নির্দেশ দেয়।"

নফসে লাওওয়ামা সম্পর্কে বলিয়াছেন-

لَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ *

"আমি নফসে লাওওয়ামার শপথ করিয়া বলিতেছি।"

আর নফসে মুতমাইন্নাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন-

يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ *

"হে নফসে মুতমাইন্নাহ।"

দ্বিতীয় গুণ ঃ নফসে মুতমাইন্নাহর আলোচনা করিয়াছেন ইহার উপাধি উল্লেখ করিয়া। অবশ্য আরবী ভাষাভাষীদের পরিভাষায় উপাধি ব্যবহার করা হয় সম্মান প্রদর্শনের জন্য। তাহাদের কাছে উপাধি গৌরবের বিষয়।

তৃতীয় গুণ ঃ আল্লাহ পাক এই নফসের প্রশংসা করিয়াছেন যে, এই নফস

তুষ্টতার গুণে গুণান্বিত। ইহার প্রশংসাতে এই গুণের উল্লেখ করাতে বুঝা গেল যে এই নফস অনুগত এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হ্ইয়া থাকে।

চতুর্থ গুণ ঃ আল্লাহ পাক ইহার গুণ উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা মুতমাইন্নাহ। মুতমাইন নীচু ভূমিকে বলা হয়। যাহা তুষ্টতা ও নম্রতার সাথে নীচ হইয়া থাকে। সুতরাং মুতমাইন নফস বলা হয় এমন নফসকে যাহা নিজে নিজে নম্রতা ও বিনয়ের সাথে তুষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আল্লাহ পাক এই নফসের প্রশংসা করিয়াছেন যাহাতে ইহার উচ্চ মর্যাদার কথা বুঝা যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে নম্রতা অবলম্বন করে; আল্লাহ পাক তাহার মর্যাদা উচ্চ করিয়া দেন।

পঞ্চম গুন ঃ বলা হইয়াছে,

ارْجِعِىٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة

"হে নফসে মুতমাইন্নাহ! তুমি স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তুমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট। আর তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।"

অত্র আয়াতে ইংগিত করা হইয়াছে যে নফসে আম্মারা আর নফসে লাওওয়ামা সম্মানের সাথে প্রত্যাবর্তন করার অনুমতি নাই। ইহা একমাত্র নফসে মুতমাইন্নার নসীব হইয়াছে। কেননা নফসে মুতমাইন্নাহ্ তো তুষ্ট থাকার গুণে গুণান্বিত। ইহার প্রতি নির্দেশ হইয়াছে যে, খুশী ও পছন্দের সাথে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। কেননা আমার দরবারে তোমার আগমন এবং আমার বেহেশতে তোমার সর্বদা অবস্থান আমি মঞ্জুর করিয়াছি। ইহাতে তুষ্ট থাকার গুণ অর্জন করার প্রতি মানুষকে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। আর ইহাও বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আল্লাহর আনুগত্য অবলম্বন না করে আর ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তুষ্ট থাকার গুণ অর্জন করার পর্যায়ে পৌঁছিতে সক্ষম হইবে না।

ষষ্ঠ গুণ ঃ আয়াতে ارجعى الى ربك বলা হইয়াছে- ارجعى الى الله বলা হয় নাই। অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর বলা হইয়াছে। আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর- বলা হয় নাই। আল্লাহ বলার স্থানে তোমার প্রতিপালক বলা হইয়াছে। অথচ আল্লাহ এবং তোমার প্রতিপালক অভিন্ন। আল্লাহ না বলিয়া তোমার প্রতিপালক বলার মধ্যে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, আল্লাহর দিকে নফসে মুতমাইন্নাহের প্রত্যাবর্তন তাঁহার প্রতিপালন গুণের অনুগ্রহ

হিসাবে। তাঁহার উপাস্য হওয়ার গুণের প্রভাবে নয়। অধিকন্তু এইরূপ বলার পিছনে উদ্দেশ্য হইল ইহাকে নিজের অন্তরঙ্গ করা এবং স্বীয় অনুগ্রহ মেহেরবানী প্রকাশ করা।

সপ্তম গুণ ঃ আয়াতে راضية বলা হইয়াছে।

অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতি অর্থাৎ আল্লাহর আহকামের প্রতি এবং আখেরাতেও তাঁহার প্রতি অর্থাৎ তাঁহার বদান্যতা ও বখশিশের প্রতি সন্তুষ্ট থাক। ইহাতে বান্দাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে যে, তুষ্ট ও সন্তুষ্ট থাকা ব্যতীত আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন অর্জিত হইবে না। ইহাতে এই ইঙ্গিতও করা হইয়াছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আখেরাতে আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হইতে পারিবে না। লক্ষ্য কর راضية প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে। আর مرضية পরে উল্লেখ করা হইয়াছে। راضية অর্থ- নফস আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া। আর مرضية অর্থ- আল্লাহ নফসের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

এই ক্ষেত্রে এক প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, অত্র আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, বান্দা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার ফল হইল আল্লাহ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট। কিন্তু অন্য এক আয়াতে ইহার বিপরীত বুঝা যায়। যেমন কুরআনে অন্য এক স্থানে বলা হইয়াছে,

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ *

"আল্লাহ পাক তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারা আল্লাহর পাকের প্রতি সন্তুষ্ট।"

অত্র আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, বান্দার প্রতি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির ফল হইল বান্দা আল্লাহ পাকের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া।

এই আপত্তির সারকথা এই যে, এক আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে সন্তুষ্টি বান্দার পক্ষ থেকে আগে হয়। অন্য আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে,, সন্তুষ্টি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগে হয়। এই আপত্তির নিরসন খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া অপরিহার্য। প্রত্যেক আয়াত স্ব স্ব অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং رضى الله عنهم و رضوا عنه আয়াতের সারকথা এই যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রথমে অস্তিত্ব লাভ করে। অতঃপর বান্দার সন্তুষ্টি। আর বাস্তবও ইহার অনুকূলে। কেননা আল্লাহ পাক প্রথমে সন্তুষ্ট না হইলে বান্দা কি করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে? কেননা বান্দার পূর্ণতা হাকিকী ও মৌলিক নহে। আল্লাহ পাকের পূর্ণতা হাকিকী এবং

মৌলিক আর মৌলিক জিনিসের অস্তিত্ব আগে হয়। সুতরাং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি আগে অস্তিত্বশীল হওয়া অপরিহার্য। কবি বলেন-

اگر ازجنتب معشوق نباید گشتی + طبب عاشق بیچارہ بجائے نرسید

যদি প্রেমাস্পদের পক্ষ হইতে কোন ঘুরাফিরা (উদ্যোগ) না হয়। তাহা হইলে অসহায় প্রেমিকের তলব কোন স্থানে পৌঁছিবে না।

আর দ্বিতীয় আয়াতের সারকথা, এই যে, বান্দা যখন আল্লাহ পাকের প্রতি দুনিয়াতে সন্তুষ্ট থাকিবে তখন পরকালে আল্লাহ পাক বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন। ইহাতো পরিষ্কার কথা।

অষ্টম গুণ ঃ আল্লাহ পাক নফসে মুতমাইন্নাহ সম্পর্কে مرضية শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই নফসের যতগুলি প্রশংসা করা হইয়াছে তন্মধ্যে ইহা সর্বোচ্চ প্রশংসা।

আল্লাহ পাক বলেন-

رضوان من الله اكبر *

"আল্লাহ পাকের সামান্যতম সন্তুষ্টিও বড়।"

বেহেশতীদের নিয়ামতসমূহের কথা বর্ণনা করার পর আল্লাহ পাক উপরোক্ত কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন। সারকথা বেহেশতীদের নিয়ামতের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি সর্বোচ্চ নিয়ামত।

নবম গুণ ঃ আল্লাহ পাক নফসে মুতমাইন্নাহ সম্পর্কে বলিয়াছেন-

فادخلى فى عبادى *

"হে নফসে মুতমাইন্নাহ। তুমি আমার খাছ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া যাও।"

আল্লাহর পাকের এই বাণীতে ইহার জন্য খুব বড় সুসংবাদ এই যে, ইহাকে খাছ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আহবান করা হইতেছে। যাহাদিগকে নফসে মুতমাইন্নাহর অন্তর্ভূক্ত হইতে আহবান করা হইতেছে তাহারা কেমন বান্দা হইবে? স্বাভাবিকভাবে বুঝা যায় যে, তাহারা আল্লাহর বিশেষ বান্দা। তাহাদের প্রতি আল্লাহ পাকের সাহায্য সহযোগিতা হইয়াছে। তাহারা ঐ সকল বান্দা নহে যাহাদের প্রতি আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট। আল্লাহ পাক এই সকল বিশেষ বান্দাদের সম্পর্কে শয়তানকে বলিয়া দিয়াছেন-

ليس لك عليهم سلطان *

"তাহাদের উপর তোমার কোন শক্তি খাটিবে না।"

শয়তান বলিল,

الا عبادك منهم المخلصين *

"আপনার মুখলেছ বান্দাদের প্রতারিত করিব না।"

এখানে বিশেষ বান্দা বলিয়া ঐসকল বান্দাদিগকে বুঝানো হয় নাই যাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে-

ان كل من فى السموات و الارض الا اتى الرحمن عبدا *

"আসমান ও যমীনে যাহারা আছে তাহাদের সকলেই পরম দয়ালুর (আল্লাহ পাকের) কাছে বান্দা হইয়া আসিতে হইবে।"

নফসে মুতমাইন্নাহ সম্পর্কে আল্লাহ পাক দুইটি ইরশাদ করিয়াছেন। এক, তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া যাও।

দুই, তুমি আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

উভয় ইরশাদের মধ্যে প্রথম ইরশাদ শুনিয়া নফসে মুতমাইন্নাহ অধিক খুশী হইয়াছে। কেননা প্রথম ইরশাদে বান্দাকে আহবান করা হইয়াছে জান্নাতের দিকে।

দশম গুণ ঃ আল্লাহ পাক و ادخلى جنتى বলিয়াছেন, ইহাতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, নফসে মুতমাইন্নাহের যে সব আলোচনা হইয়াছে, এই সব গুণের কারণে ইহা আল্লাহর খাছ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার এবং জান্নাতে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। দুনিয়াতে জান্নাত হইল আল্লাহ পাকের আনুগত্য। আর আখেরাতের জান্নাত হইল বেহেশ্‌ত। যাহা সকলের কাছে পরিচিত।

কতগুলি উপকারী আলোচনা

উল্লিখিত আয়াত দুইটি গুণের ধারক। প্রত্যেকটি গুণের চাহিদা হইল ব্যবস্থা অবলম্বন পরিত্যাগ করা। এই দাবীর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ আল্লাহ পাক নফসে মুতমাইন্নাহের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হইল তুষ্ট থাকা, অস্থিরচিত্ত না হওয়া। অপরটি রাজী থাকা।

নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করা ব্যতীত উল্লেখিত গুণদ্বয়

অর্জিত হইতে পারে না। কেননা কোন ব্যক্তি তখনই তুষ্ট ও স্থিরচিত্ত হইবে যখন সে আল্লাহ পাকের সুব্যবস্থার প্রতি ভরসা করিয়া তাঁহার সামনে নতশির হইয়া যাইবে। তাঁহার নির্দেশ মান্য করিবে। তাঁহার অনুগত থাকিবে। আর তাঁহার প্রভুত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হইবে। তাঁহাকে একমাত্র উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করিবে। তাঁহার সম্পর্কে সংশয়যুক্ত হইবে না। আল্লাহ পাক প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিবেকের নূর দিয়াছেন। এই নূর তাহাকে দৃঢ়পদ রাখিবে। অধিকন্তু সে আল্লাহ পাকের আহকামের সামনে নিজকে দেহমনে অর্পন করিয়া রাখিবে। অবস্থার বিবর্তনে নিজকে তাঁহার সামনে সোপর্দ করিয়া রাখিবে।

উপকারী আলোচনা

বান্দার ব্যবস্থা অবলম্বন ও তাহার এখতিয়ার সৃষ্টি করার মধ্যে রহস্য ও ভেদ হইল আল্লাহ পাকের প্রতাপশালীতার গুণের প্রকাশ করা। সুতরাং আল্লাহ পাক যখন বান্দাদিগকে স্বীয় প্রতাপশালীতার গুণের সাথে পরিচিত করাইতে ইচ্ছা করিলেন তখন বান্দাদের এখতিয়ার ও ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদের থেকে পর্দার অন্তরালে রহিলেন। তখন তাহাদের দ্বারা ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইল। কেননা যদি বান্দারা আল্লাহ পাকের সম্মুখে থাকিত এবং আল্লাহ পাককে দেখিতে পাইত তাহা হইলে তাহাদের জন্য কখনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা ও এখতিয়ার খাটানো সম্ভব হইত না। যেমন উর্ধ্বজগৎবাসীর জন্য সম্ভব হয় না। সুতরাং বান্দা যখন স্বীয় এখতিয়ার খাটানো এবং ব্যবস্থা অবলম্বন করা শুরু করিল তখন আল্লাহ পাক বান্দার এই কার্যের মোকাবিলায় স্বীয় প্রতাপ নিয়োজিত করিলেন এবং তাহাদের এখতিয়ার ও ব্যবস্থা অবলম্বনের স্তম্ভগুলি ভাঙ্গিয়া চুরচুর করিয়া দিলেন। এইভাবে তাঁহার ইচ্ছা প্রাধান্য লাভ করিল। সুতরাং তিনি যখন এইভাবে বান্দাদিগকে স্বীয় ইচ্ছার প্রাধান্যের পরিচয় করাইলেন তখন তাহাদের একীন হইল যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দাদের উপর প্রতাপশালী। সুতরাং আল্লাহ পাক তোমার মধ্যে যে ইচ্ছার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এইজন্য করেন নাই যে, তোমার ইচ্ছা তোমার নিজস্ব কোন জিনিস। বরং এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তাঁহার ইচ্ছা তোমার ইচ্ছার উপর বিজয়ী থাকে এবং তুমি বুঝিতে পার যে, তোমার ইচ্ছা কিছুই নয়। অনুরূপভাবে তোমার ব্যবস্থা অবলম্বনও এই জন্য সৃষ্টি করেন নাই যে, তুমি সর্বদা ব্যবস্থা অবলম্বনে নিমজ্জিত থাকিবে। বরং এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তুমিও ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে আর তিনিও ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু তাহার ব্যবস্থা চলিবে আর তোমার ব্যবস্থা চলিবে না। এক

বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আপনি কিভাবে আল্লাহকে চিনিতে পারিয়াছেন? তিনি জবাব দিলেন, ইচ্ছা রহিত করার দ্বারা।

অনুচ্ছেদ ঃ ইতিপূর্বে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলাম যে, রিযিকের তদবীর সম্পর্কে একটি পৃথক অধ্যায় কায়েম করিব। কেননা, অধিকাংশ অন্তরে যে সব ক্ষেত্রে ব্যবস্থা অবলম্বনের চিন্তাধারার উৎপত্তি হয়- ইহাদের অধিকাংশ হইয়া থাকে রিযিক সম্পর্কে। ইতিপূর্বে সাধারণ ব্যবস্থা অবলম্বনের আলোচনা হইয়াছে আর এখন রিযিক সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের আলোচনা হইতেছে।

রিযিকের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বনের চিন্তাধারা হইতে অন্তর মুক্ত থাকা আল্লাহ পাকের একটি বড় অনুগ্রহ। আল্লাহ পাক যাহাকে ইহার তাওফীক দিয়াছেন, একমাত্র সেই এই পর্যায় অর্জন করিতে পারে।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের প্রতি সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছে তাহার অন্তর স্বস্থিরতা লাভ করিয়াছে। সে স্বীয় তাওয়াক্কুল মজবুত করিয়া লইয়াছে।

এমনকি এক বুযুর্গ বলিয়াছেন, রিযিকের ব্যাপারটি মজবুত করিয়া ধর আর অন্যান্য বিষয়গুলি যাইতে দাও। তাহার উক্তির সারকথা তিনি স্বীয় শিষ্যদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, রিযিক সম্পর্কে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা মজবুত করিয়া লও; তাহা হইলে অন্যান্য বিষয়ে খুব একটা মেহনত পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে না। কোন এক বুযুর্গ বলেন যে, সর্বাধিক ভারী চিন্তা হইল আহারের চাহিদা হওয়া। প্রথমোক্ত বুযুর্গ যাহা বলিয়াছেন উহার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ পাক মানুষকে এমন জিনিসের সাহায্যের প্রতি মুখাপেক্ষী করিয়াছেন যাহা দ্বারা মানুষের দৈহিক গঠন ঠিক থাকে এবং তাহার দেহে শক্তি বৃদ্ধি হয়। কেননা মানব দেহে স্বভাবজাত যে উষ্ণতা আছে তাহা শরীরের বিভিন্ন অংশকে দুর্বল করিয়া দেয়। আর যখন তাহার দেহে খাদ্য পৌঁছে তখন পাকস্থলী ইহা মন্থন করে। ইহার সার অংশটুকু দেহের বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করে। অতঃপর এই সার পদার্থটুকু দেহের অংশে পরিণত হয় আর দুর্বলতার পরিপূরক হইয়া যায়। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করিলে বান্দাকে খাদ্যের মুখাপেক্ষী না করিয়াও পারিতেন। কিন্তু তিনি প্রাণীদিগকে খাদ্যের মুখাপেক্ষী করার এবং খাদ্যের জন্য অস্থির বানানোর ইচ্ছা করিলেন। আর নিজে এই সব প্রয়োজনের উর্ধ্বে থাকার কথা প্রকাশ করিতে চাহিলেন।

আল্লাহ পাক বলেন-

قُلْ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ *